শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার দ্বিমাসিক

আল-আমীন বার্তা

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫

আল-আমীন মিশন

সবার আগে, সবার সঙ্গে

উদ্দেশ্য

● শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে-পড়া সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ● দুঃস্থ ও অসহায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী, যাদের হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল, তাদের মেধার বিকাশে সাহায্য করা। ● আধুনিক জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার সংমিশ্রণে ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

আবেদন

আল-আমীন মিশনের মূল ক্যাম্পাস, খলতপুর উদয়নারায়ণপুর হাওড়ায় দু-বিঘে জমির ওপর প্রস্তাবিত তিনতলা **'আল-আমীন জামে মসজিদে'**র নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে তা শেষ হবে ইনশাআল্লাহ্। মোট আয়তন প্রায় ১৯ হাজার বর্গফুট। ক্যাম্পাসের এক হাজার ছাত্রসহ প্রায় তিন হাজার মানুষ একত্রে নমাজ পড়তে পারবেন। এই মসজিদের নকশা তৈরি করেছেন ভারত-বিখ্যাত আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার মোস্তাক আহমেদ। এই পবিত্র ও মহৎ উদ্যোগে আপনাদের সবাইকে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই।

প্রতিষ্ঠানের বিস্তার

❖ কাজের পরিধি: পশ্চিমবঙ্গের ১৭-টি জেলায় এবং অসমের হাউলি, ত্রিপুরার বক্সানগর, ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, বিহারের পাটনা আর উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে। ❖ প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র ২৬-টি। ❖ সর্বমোট আবাসিক ক্যাম্পাস ৫৩-টি। ❖ বর্তমানে মোট আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ১১১৯৪ জন।

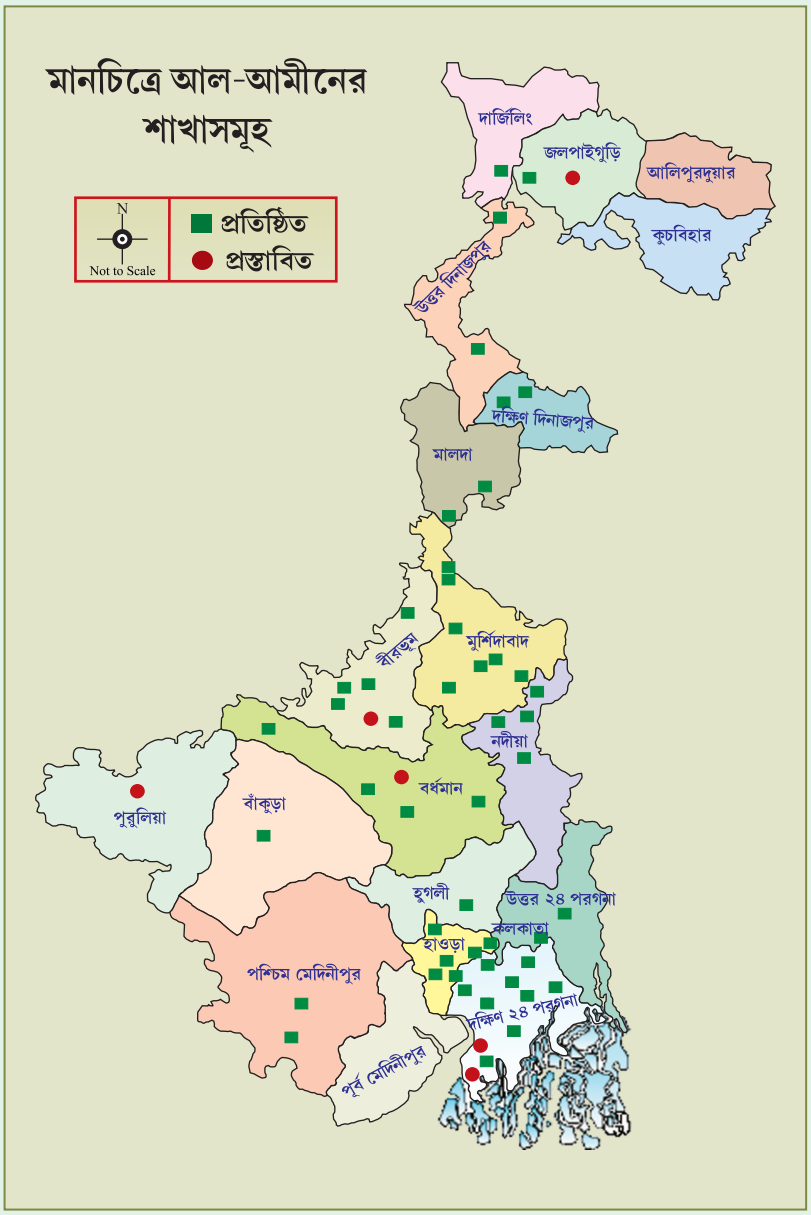

❖ ছাত্র ৭৭০৪ (৬৯%), ছাত্রী ৩৪৯০ (৩১)%।

❖ দুঃস্থ, নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী ২৫%।

❖ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী ৪২%।

❖ মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী ৩৩%।

❖ শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ১:১৫।

প্রাক্তনী পরিসংখ্যান

● মেডিকেলে সফল ১৪১১ জন।
● ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সফল ১৭৬৩ জন।
● ডব্লিউবিসিএস ও অ্যালায়েড সার্ভিসে সফল ৫২ জন।
● মাধ্যমিকে পাস করেছে ৪৬০৯ জন।
● উচ্চ-মাধ্যমিকে পাস করেছে ৭৮১২ জন।

আল-আমীন মেরিট স্কলারশিপ

প্রিয় নবি হজরত মহম্মদ (স.)-এর নাম অনুসারে 'আল-আমীন মেরিট স্কলারশিপ' মিশনের দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মেডিকেল/ ইঞ্জিনিয়ারিং ও উচ্চশিক্ষার খরচ বহনের জন্য চালু করা হয়েছে। এতিম ও অসহায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গঠনে সাহায্য করতে এই স্কলারশিপ ফান্ডে দান করার আবেদন জানাই। বর্তমানে মোট ১৩২ জন ছাত্র-ছাত্রী এই সুবিধা পাচ্ছে, যাদের জন্য বছরে প্রায় ১৫ (পনেরো) লাখ টাকা খরচ হবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যে আপনার দান **Al-Ameen Mission Trust**-এর নামে পাঠাতে পারেন। আপনার এই দান ভারতীয় আয়কর আইনের '৮০ জি' ধারায় আয়কর মুক্ত।

অনুসৃত পদ্ধতি

● রাজ্য জুড়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা ও অভিভাবক সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হয়।
● মেধার ভিত্তিতে ইন্টারভিউ ডাকা হয় ও আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে ফিজ নির্ধারিত হয়।
● ভর্তি নেওয়া হয় পঞ্চম থেকে নবম ও একাদশ শ্রেণিতে।
● শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আল-আমীন বার্তা

কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২২ • নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫ • মহরম-সফর ১৪৩৭ । পঞ্চম বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা

জ্ঞান বিজ্ঞান

অতনুমিথুন মণ্ডল

অপার রহস্যে ভরা নক্ষত্রের ধুলো ০৬

দৃষ্টিপাত

আবুল হাসনাত

রবীন্দ্রনাথের গানে সুফি-ভাবনা ১২

উজ্জ্বল প্রাক্তনী

আসাদুল ইসলাম

বাড়ির চেয়ে বেশি পেয়েছি মিশন থেকে ১৮

মুক্তভাষ

এন জুলফিকার

বন্ধু ডলফিন ২১

পুনর্মুদ্রণ

শামসুন নাহার

শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা ২৩

বিশ্ববিচিত্রা

ফরিদা নাসরিন

বহু-সীমান্তের নদী । কার্মান রেখা । জাফরান ২৯

সাতপাঁচ

নেহা চৌধুরী । দেবজ্যোতি রায়

দেশ । ভাষা । বইভব । সবজান্তা ৩৩

হাজার দুয়ারি

মহম্মদ মহসীন আলি

উচ্চশিক্ষার নানা পথে ৩৭

আরও লেখা

বাণী ০৩

পাঠকনামা ০৪

সম্পাদকীয় ০৫

শিখরদেশ ২৬

রত্ন চতুষ্টয় ৩১

মিশন সমাচার ৪০

আমাদের পাতা ৪৪

মুদ্রণ বিবরণী

পরামর্শ পরিষদ
ননীগোপাল চৌধুরী একরাম আলি সেখ মহম্মদ হাসান
সেখ মারুফ আজম এম আব্দুল হাসেম মাইনুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক
এম নুরুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
শেখ হাফিজুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী
দিলদার হোসেন একরামুল হক শেখ
আসাদুল ইসলাম সেলিম মল্লিক

জনসংযোগ
মহম্মদ আসরাফুল হোসেন মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস
সেখ মোমিনুর রহমান তসলিম আরিফ
সেখ মহম্মদ ইস্রাফিল মহম্মদ মহসীন আলি

ইন্টারনেট সংস্করণ
আব্দুল কাইয়ুম বিশ্বাস

বর্ণস্থাপন এবং গ্রাফিক্স
মহম্মদ গোলাম কিবরীয়া

প্রচ্ছদ
মেহাজাবিন খাঁন (ষষ্ঠ শ্রেণি), আল-আমীন মিশন, পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক সেন্ট্রাল অফিস ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।

মতামত এবং লেখা পাঠাবার ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক, আল-আমীন বার্তা, ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০ টাকা, সডাক ২০০ টাকা ● **প্রতি সংখ্যা** ২৫ টাকা

দূরভাষ ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯, ৩২৯৭ ৩৫৮০
ফ্যাক্স ৯১৩৩ ২২২৯ ৩৭৬৯
e-mail: alameenbarta@gmail.com
weblink: www.alameenmission.org
facebook.com/alameen.barta

যারা এতিমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

— আল-কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত ৪

হজরত আয়েশা (র.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন: আল্লাহ্র নিকট সেই লোক সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত, যে অতি ঝগড়াটে।

— সহিহ্ বুখারি, হাদিস সংখ্যা ২২৯৫

কালামের জীবনপাঠ

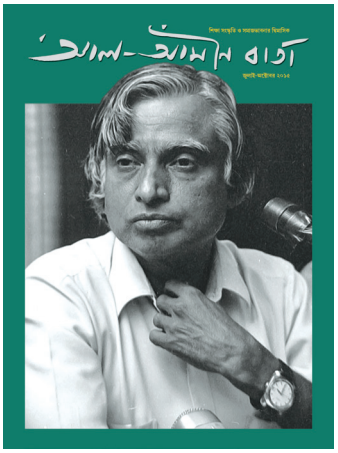

'স্বপ্ন সেটা নয়, যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে। স্বপ্ন সেটাই, যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমোতে দেয় না।'

আল-আমীন মিশনের মুখপত্র 'আল-আমীন বার্তা'র ছত্রে ছত্রে এই স্বপ্ন পূরণের প্রত্যাশা, অনুরণনকে প্রতিদিন ছাপিয়ে যাওয়ার একটা গল্প, অনুষঙ্গ থাকে। স্বপ্ন দেখা ও তা সাকার করার এক অনন্য উদাহরণ— এক অনন্য জীবন এ পি জে আবদুল কালামকে নিয়ে 'আল-আমীন বার্তা'র জুলাই-অক্টোবর ২০১৫-র বিশেষ সংখ্যা দেখে ও পড়ে মুগ্ধ হলাম। কালামের জীবনপাঠ ও তাঁকে আধুনিক ভারতের মননসত্তার অংশ করে নেওয়ার কী প্রয়োজনীয়তা আছে, তা 'আল-আমীন বার্তা' কালাম বিষয়ক সাতটি রচনার মাধ্যমে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে।

স্বপ্ন দেখার, স্বপ্ন দেখানোর কারিগর ছিলেন কালাম। তাঁর জীবনবোধ, জীবনচর্যা আমাদের অনন্তকাল ধরে স্বপ্ন দেখিয়ে যাবে। স্বপ্ন দেখতে যে বুকের পাটা লাগে, তার অফুরান রসদ তিনি আমাদের জুগিয়ে যাবেন।

গভীর দেশাত্মবোধ, ভালোবাসা আর বিশ্বাস কাকে বলে, কালাম তা তাঁর সারা জীবনের কাজ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। কী অসাধারণ উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তাঁর জীবনকে, তাঁর জীবনবোধকে।

একরাম আলি তাঁর রচনায় কালামের জীবনের খুব সুন্দর সুন্দর দিক তুলে ধরেছেন। সেলিম মল্লিকের 'শৈশবের দিনগুলি'তে তাঁর বেড়ে ওঠা, ভবিষ্যতে মানুষ হয়ে ওঠার রসদ খুঁজে নেওয়ার উপলব্ধি আছে। জাভেদ ইকবালের 'কালাম যখন ছাত্র' লেখার মধ্যেও একটা উপলব্ধির নির্যাস আমরা পেয়ে যাই। ছাত্রজীবনকে তিনি এতটাই উপভোগ করেছিলেন, চুরাশি বছর বয়সেও জীবনের শেষ সময়টিতে শিক্ষার্থীদের মাঝেই ছিলেন কালাম। অতনুমিথুন মণ্ডল যথার্থভাবেই কালামকে ভারতীয় হৃদয়ের স্ফুলিঙ্গ বলেছেন তাঁর লেখায়। একরামুল হক শেখ তাঁর 'চিরকালীন শিক্ষক' রচনায় কালামের শিক্ষকসত্তা, তাঁর শিক্ষাচিন্তা, শিক্ষার প্রতি তার অদম্য প্যাশন খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। জীবনের শেষ দিনে, ২৭ জুলাই ২০১৫, ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, শিলংয়ে কালামের ভাষণের বিষয় ছিল 'Making this earth a more liveable planet'। এ-বিশ্বকে শিশুদের বাসযোগ্য করবার অঙ্গীকার প্রকাশ পেতে চেয়েছিল কালামের সে-দিনের ভাষণে। নাজিব আনোয়ারের 'জনতার রাষ্ট্রপতি' খুব সুন্দর রচনা। তাঁর লেখার থেকে আমরা জানতে পারি, 'যেকোনো কাজকে জাতীয় মিশনে পরিণত করা ছিল তাঁর অদম্য ইচ্ছা।' তাহেরা খাতুনের 'স্বপ্নের কয়েক মিনিট' সুন্দর উপলব্ধির একটা পাতা।

শিক্ষা নিয়ে, সমাজ নিয়ে, সমাজের সামগ্রিক উত্তরণ নিয়ে তিন দশক আগে স্বপ্ন দেখেছিল আল-আমীন মিশন। স্বপ্ন দেখেছিলেন আল-আমীন মিশনের সেই স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষটি। স্বপ্ন একটা ধনাত্মক ভাবনাকে, একটা প্রত্যয়কে কী করে বাস্তবের মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করতে পারে, আল-আমীন মিশন তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

কালামের 'Vision: 2020', 'Wings of Fire', 'Ignited Minds' পড়তে পড়তে যেমন আমাদের ভিতরে, আমাদের চৈতন্যের ভিতরে, আমাদের সৃষ্টি-উন্মাদনার ভিতরে আগুন লেগে যায়, তেমনি 'আল-আমীন বার্তা'র লেখার মধ্য দিয়েও বাংলার অগণ্য জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীরা অনুপ্রেরণা পায়, স্বপ্ন দেখার সাহস সঞ্চয় করে বুক বাঁধতে শেখে নতুন আশায়। এইরকম স্বপ্ন দেখা থেকেই আমার পাশের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক শামিম বিশ্বাস হয়ে ওঠে ডিএসপি। এই স্বপ্ন অক্লান্ত পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের ওপর ভর করেই আল-আমীন মিশন থেকে মেডিকেলে সাফল্য পায় পিছিয়ে-পড়া প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রায় দুই শতাধিক আগুনপাখি ছাত্রছাত্রী। আরও অন্যান্য সফলতা। এও এক অসাধারণ স্বপ্নের উড়ান-কাহিনি। যে-কাহিনি বাস্তবের মাটিতে বীজ ফলিয়ে আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষকে সমুন্নত করে তুলবে। জাতিগঠনের অখণ্ড প্রচেষ্টার অঙ্গীভবন হবে আমাদের সম্মিলিত আত্মা।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সঙ্গে নিয়ে 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। ভারতবর্ষ নামক সেই Knowledge Super Power-এর সঙ্গে অঙ্গীভূত করতে হবে শিক্ষায় ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে যাওয়া আমাদের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে। কালামের স্বপ্ন আমাদের সেই উড়ানে সর্বদা পাশে থেকে সাহায্য করে যাবে, রসদ জুগিয়ে যাবে। যে শ্রেণিবৈষম্যহীন, বিদ্বেষশূন্য, পরশ্রীকাতরতাহীন সমাজের স্বপ্ন কালাম দেখিয়েছিলেন, প্রকৃত শিক্ষাই সেই স্বপ্নের বাস্তবতাকে উদ্‌বোধিত করতে পারে, প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

আল-আমীন মিশন দেশের জন্যে, দশের জন্যে সুনাগরিক গড়ে তোলার যে-ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেছে, কালামের স্বপ্নের দ্যোতনা হয়ে উঠছে, সমাজের অন্যান্য এগিয়ে যাওয়া সম্প্রদায়ও সেটা উপলব্ধি করছে। সেটা আমরা আজ প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করছি। 'A Movement From Within'– সমাজের মধ্যে থেকে, সমাজের মধ্যে বাস করেই, সমাজের ভালোমন্দগুলোকে বিচার করতে-করতেই কী অসাধারণভাবে উত্তরণের পথ দেখানো যায়— সমাজ পরিবর্তনের দিশা দেখানো যায়— আল-আমীন মুভমেন্ট সেইসমস্ত ভাবনার, মননশীলতার, কর্মযজ্ঞের মেলটিং পট, ব্লাস্ট ফারনেস।

'আল-আমীন বার্তা'র অন্যান্য প্রত্যেকটা লেখার মধ্যে স্বপ্ন দেখার, স্বপ্ন দেখানোর অদম্য সাহসের অনুরণন। প্রত্যেকটা সংখ্যা যেন অসাধারণ উপস্থাপনগুণে হয়ে ওঠে ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্নের ডানায় সরবরাহকারী সুবাতাস, তাদের প্রত্যেকটা মুহূর্তে যেন স্মরণ করিয়ে দেয় কালামের সেই আগুনছোঁয়ানো বাণী, 'আমরা প্রত্যেকেই জন্মেছি আমাদের মধ্যে এক ঐশ্বরিক অগ্নি নিয়ে। আমাদের প্রচেষ্টা যেন হয় সেই অগ্নিকে ডানা দিতে, তার মঙ্গলআভায় এই পৃথিবীকে পূর্ণ করতে।'

এই সুন্দর পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে তুলতে হবে। পরস্পরের বিভেদ বিদ্বেষ দূরে সরিয়ে একাত্ম-ভাবনার মধ্য দিয়ে, ব্যক্তিগত ঈশ্বর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, নিষ্ঠাবান সুনাগরিক হয়ে উঠে। ধর্মাচরণ আধ্যাত্মিকতার উত্তরণের মধ্য দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আল-আমীন মিশনের শিক্ষাচিন্তা, সমাজভাবনা সেই দিশা দেখাতে চাইছে।

একরামুল হক চৌধুরী
পাথরাদহ, ধুবুলিয়া, নদীয়া

খুবই কার্যকর

'আল-আমীন বার্তা' মিশন কর্তৃপক্ষের অন্যতম উদ্যোগ। বাংলার আপামর জনসমাজের মননের সঙ্গে মিশনের যুগোপযোগী চিন্তা ও ভাবধারার পরিচয় করানোর একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে এটি অতুলনীয়। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই মহম্মদ মহসীন আলিকে, 'হাজারদুয়ারি' বিভাগে জুলাই-আগস্ট ২০১৫ সংখ্যায়, তাঁর 'স্কলারশিপের সাতসতেরো' লেখাটির জন্য। বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত লেখাটি যেকোনো স্কুল-কলেজ পড়ুয়ার প্রাথমিক বিভ্রান্তি দূরীকরণে খুবই কার্যকর, বিশেষ করে বাংলার প্রান্তিক জেলাসমূহের ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

জামিল মেহমুদ ইসলাম
ছাত্র, এনআরএস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

ত সংখ্যাটি ছিল প্রয়াত মনীষী আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালামের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। তাঁর জীবনের একেকটি পর্ব নিয়ে ছিল একেকটি নিবন্ধ। সংখ্যাটি আল-আমীন পরিবারে, এমনকী বৃহত্তর পাঠকমহলেও, খুবই আদৃত হয়েছে। এমনকী, সংখ্যাটির চাহিদা এতই ছিল যে, পুনর্মুদ্রণও করতে হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রয়াস যেমন ব্যর্থ হয়নি, তেমনই আবদুল কালামের মতো মনীষী যে বর্তমান ভারতে কত প্রাসঙ্গিক, তাঁকে জানতে চাওয়ার আগ্রহ থেকে আবার সেটা উপলব্ধি করলাম। এমন আগ্রহ থেকে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, মনুষ্যত্বের যেসব গুণাবলির জন্যে একজন ব্যক্তি প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠেন, আমরা আজও সেইসব গুণকে শ্রদ্ধা করি। এবং, আয়ত্ত করার চেষ্টা করি। আমরা ভালো হতে চাই। সৎ হতে চাই। সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতার জন্যে হয়তো সবসময় সেটা সম্ভব হয় না, তবু সেই শুভ শক্তি আমাদের অন্তরের কোথাও সুপ্ত হয়ে থাকে।

সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করবার, প্রকৃত মানুষ হয়ে সমাজের মঙ্গলচিন্তা করবার সুযোগ কেউ পায়, কেউ পায় না। যারা পায় না, আল-আমীন মিশন তাদের সহায়ক হিসেবে কাজ করে আসছে গত তিরিশ বছর। কাজটা সহজ নয়। তিপান্নটি শাখায়, সমাজের নানা স্তরের এগারো হাজার আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই কাজটি করা যে কত শক্ত, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই সেটা জানেন। কেননা, এমন অনেক পড়ুয়া এখানে আছে, যারা পরিবারের প্রথম প্রজন্ম হিসেবে স্কুলে এসেছে।

তবু, প্রকৃত শিক্ষা পেয়ে তাদের অনেকে আল-আমীন মিশন থেকে সফল হয়ে বেরিয়েছে এবং পরবর্তীকালে বৃহত্তর জীবনে নানাভাবে মানুষের কাজে লেগেছে।

তাই, আল-আমীন নিছক একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে সেই লক্ষ্যও আল-আমীনের ছিল না। আমরা চেয়েছিলাম, বাংলার পিছিয়ে-পড়া মুসলমান সমাজ প্রকৃত শিক্ষা পেয়ে উঠে দাঁড়াক। মানুষ হোক। সমাজের প্রকৃত অংশীদার হোক।

কতটা সফল হয়েছে আল-আমীন, পরিসংখ্যানই বলবে। যদিও আমরা জানি— পরিসংখ্যানে থাকে কিছু সংখ্যা। মানুষের শ্রম, অশ্রু বা আনন্দ থাকে না। জানি এই কারণে যে, পড়ুয়াদের সেই শ্রমের, একাগ্রতার, অশ্রুর এবং আনন্দের সর্বক্ষণের সঙ্গী আল-আমীন মিশন। অর্থাৎ, আল-আমীনের তিপান্নটি শাখায় শিক্ষাদানে এবং পরিচালনায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা।

রাজ্য জুড়ে আল-আমীন মিশনের প্রতি অভিভাবকদের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের এত যে আগ্রহ, তার বড়ো কৃতিত্ব এইসব শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পরিচালকদের। তাঁদের একনিষ্ঠতাই আল-আমীনের সম্পদ। আর সম্পদ রাজ্য জুড়ে ছড়ানো আল-আমীনের নানা বিভাগের কর্মীরা।

অনেকে জানেন না আল-আমীনের আর-একটি বিশেষজ্ঞ দলের কথা। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আবুল খায়ের জালালউদ্দিনের নেতৃত্বে এই দলটি পড়ুয়াদের জন্যে আধুনিকতম শিখনপদ্ধতি প্রস্তুত করে, প্রতি মুহূর্তে সেই পদ্ধতি নবায়িত করে এবং শাখায় শাখায় ঘুরে সেই নতুন পদ্ধতি কার্যকর করে। সদাব্যস্ত এই দলটিকে সংক্ষেপে বলা হয় 'অ্যাসার্ট'। পুরো নাম 'আল-আমীন সেন্টার ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং'।

এতসব মানুষের শ্রমের, মেধার আর আত্মত্যাগের ফসল আল-আমীন মিশন।

আমরা বিশ্বাস করি— প্রতিষ্ঠানের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই প্রতিষ্ঠান। সেই মানুষ আল-আমীনের সঙ্গে যুক্ত নানা বিভাগের কর্মী-সদস্যরা যেমন, তেমনই রাজ্যের অগণিত মানুষ— যাঁরা আল-আমীনকে আপন ভাবেন। সবাই মিলে অতি বৃহৎ একটি পরিবারের সদস্য আমরা, যার নাম 'আল-আমীন পরিবার'।

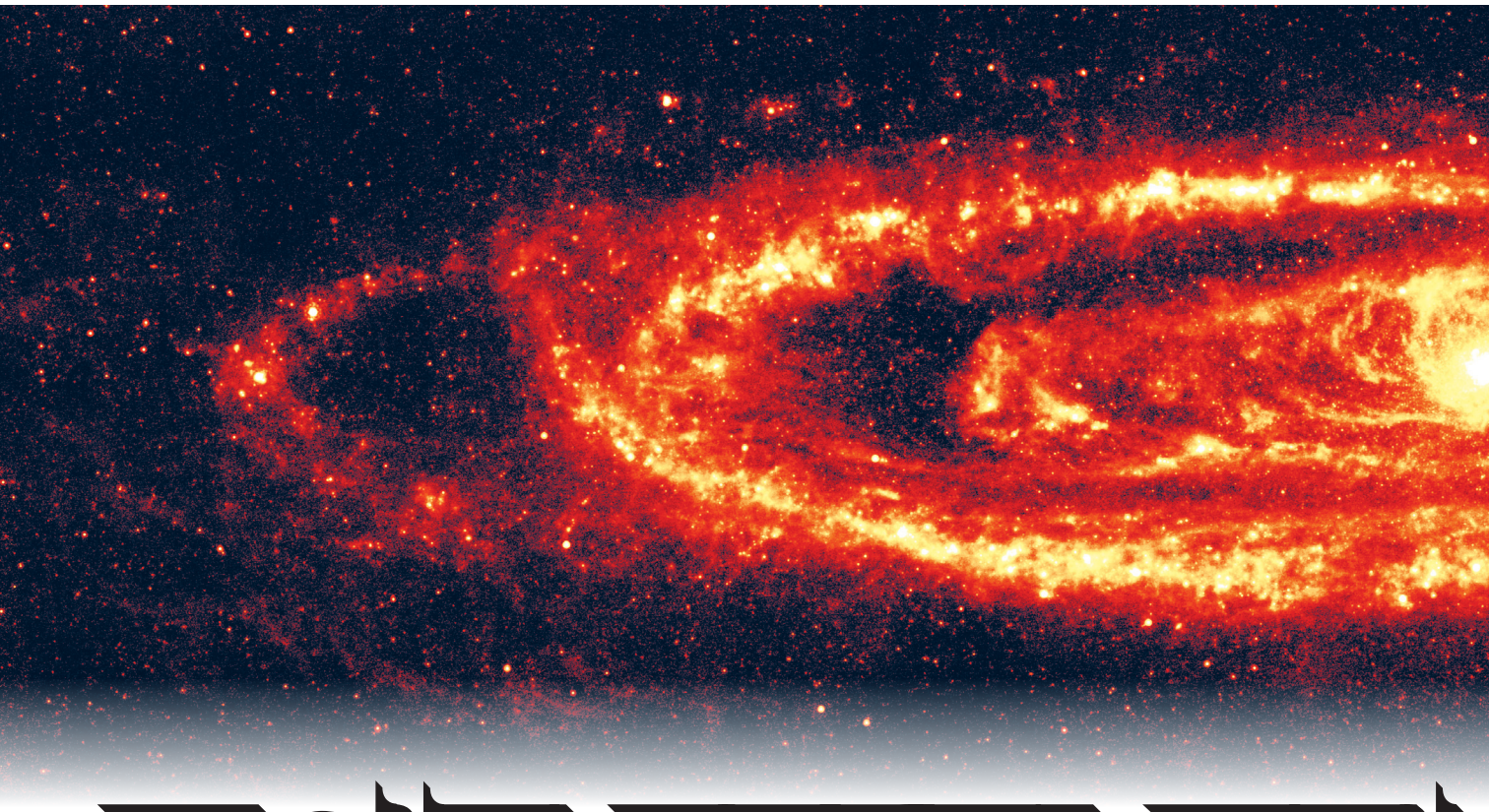

অপার রহস্যে ভরা

আদিমকাল থেকে আকাশ মানুষকে বিহ্বল করেছে। মহাশূন্য শব্দটি এসেছে অনেক পরে। বিহ্বলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আত্মপরিচয়ের স্পৃহা। আজ মানুষ মহাশূন্যে শুধু কল্পনাবিস্তারই করছে না, পৌঁছোতে চাইছে সশরীরে, না হলে পৌঁছে দিতে চাইছে তার এতদিনের অর্জিত জ্ঞানকে, আরও জানার জন্যে। লিখেছেন

অতনুমিথুন মণ্ডল

মহাবিজ্ঞানী কার্ল সাগান মজার ছলে বলেছেন আমরা সবাই নক্ষত্রের ধুলো থেকে তৈরি। কথাটি কবিতার পঙ্‌ক্তির মতো শোনালেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখলে মহাসত্য। যেমন সূর্য না থাকলে এই পৃথিবীতে নিভে যেত প্রাণের দীপ, তেমনই নক্ষত্র বিস্ফোরণ বা সুপারনোভা না ঘটলে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ত না নক্ষত্র-অবশেষ, সৃষ্টি হত না গ্রহরা। আমাদের এই পৃথিবীও রয়ে যেত কালের অন্ধকারে। রাতের আকাশের দিকে তাকালে কার না মন বিস্ময়ে ভরে ওঠে! কার না মনে প্রশ্ন জাগে এই আকাশের কি শেষ আছে কোথাও। নাকি, যত দূর পৌঁছোনো যাবে তত দূর এর বিস্তার। আমরা জানি, মিটমিট করা দূর-আকাশের তারাগুলো আমাদের সূর্যের মতো এক-একটা সূর্য। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ওই তারাগুলোর আছে নিজস্ব গ্রহ-পরিবার। ওই গ্রহগুলোয় কি প্রাণ আছে? যদি থাকেও, অন্য গ্রহের প্রাণীরা কি কোনোদিন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে? তারা দেখতে কেমন, আমাদের চেয়ে দুর্বল না শক্তিশালী, শক্তিশালী হলে তারা কি আমাদের হারিয়ে এই পৃথিবী দখল করে নেবে, যেমন দেখা যায় কল্পবিজ্ঞানের গল্প বা সিনেমায়। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো যে-প্রশ্নটা বার বার মনে জাগে, কীভাবে সৃষ্টি হল মহাকাশ, তার গায়ে চুমকির মতো বসানো লক্ষ লক্ষ তারা, আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে আলোর নদীর মতো বয়ে যাওয়া ছায়াপথ। শিশু থেকে বয়স্ক মানুষকে পর্যন্ত এই প্রশ্ন যুগে যুগে ভাবিয়েছে।

বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণা ও অনুসন্ধানী মন ক্রমে ক্রমে এ-রহস্যের জট অনেকটা ছাড়ালেও অনেক কিছুই রয়ে গেছে অজানা। ভবিষ্যতে আরও যত জানা হবে তত নতুন অজানার মুখোমুখি হব আমরা। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের বর্তমান মহাবিশ্বেই রয়ে গেছে অতীত মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য সমাধানের ইঙ্গিত। সেই অর্থে আমাদের বর্তমান মহাবিশ্ব (Universe) এক বিশাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা তদন্তসূত্র। তদন্তসূত্র থেকে

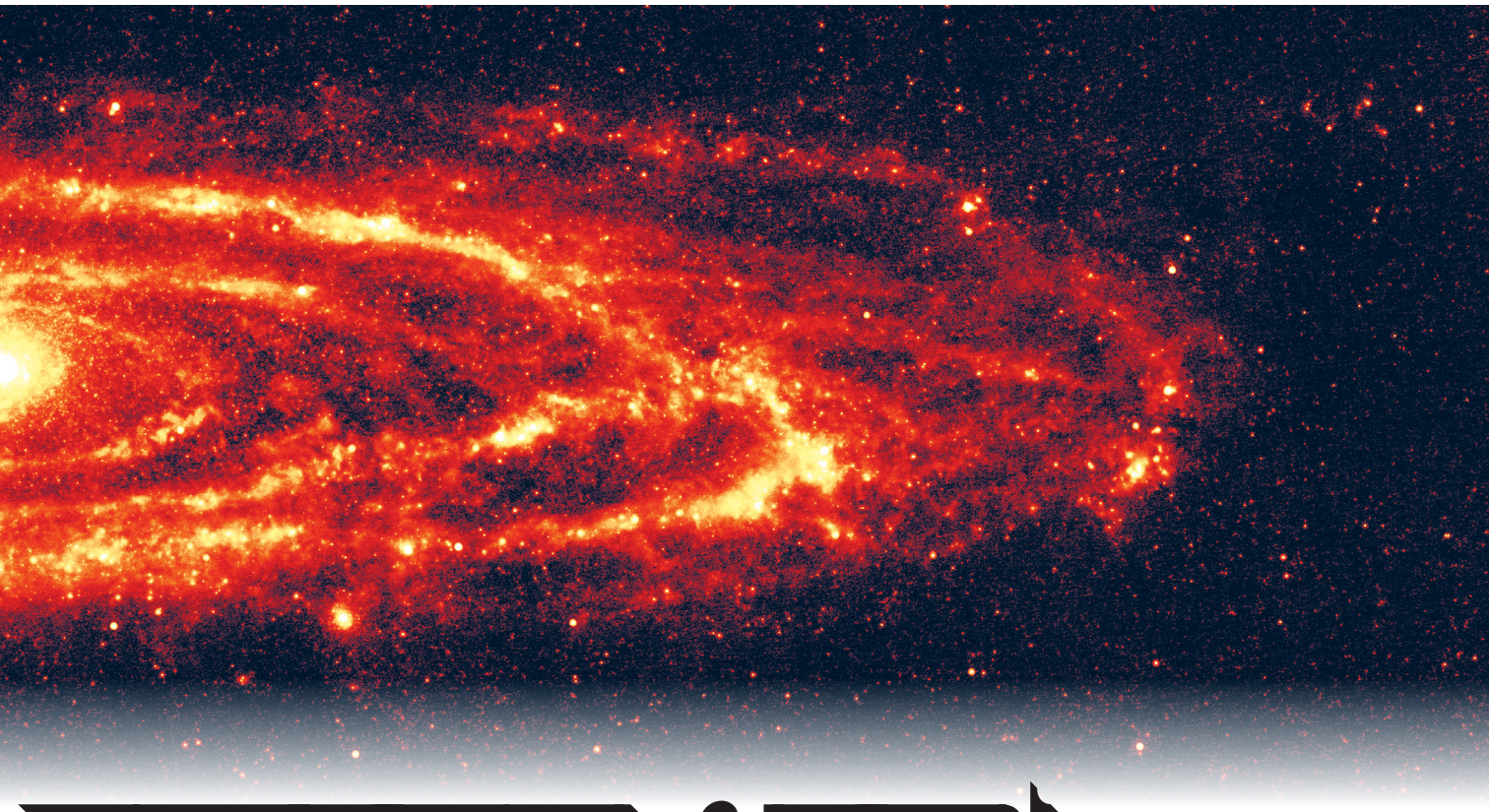

নক্ষত্রের ধুলো

যেমন রহস্যকাহিনির নায়ক সমাধান করেন রহস্যের, ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাহায্যে চিনে নেন অপরাধীকে, অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাকে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তোলেন, তেমনই বর্তমান মহাবিশ্বের নিবিড় অনুসন্ধানেই আমরা খুঁজে পাব এর উৎস।

১৯২০ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে একশো ইঞ্চি ব্যাসের দর্পণযুক্ত নতুন টেলিস্কোপটি দিয়ে পর্যবেক্ষণ শুরু হয়। তার ফলে আরও কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের মতো মহাশূন্যে আরও অনেক নতুন নতুন ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি আবিষ্কৃত হয়, এবং মানুষ প্রথম বুঝতে পারে, নক্ষত্রগুলি আলাদা আলাদা থাকে না, এরা থাকে পুঞ্জে পুঞ্জে। বিভিন্ন ছায়াপথে এদের অবস্থান। এই নতুন আকাশ পর্যবেক্ষণের শরিক ছিলেন বিজ্ঞানী এডউইন হাবল ও তাঁর সহকারী মিলটন হিউমেসন। মিলটন হিউমেসনের জীবন বড়ো অদ্ভুত। ১৮৯১ সালে তিনি মিনেসোটা প্রদেশের ডজ সেন্টারে জন্ম গ্রহণ করেন। যখন তাঁর বয়স চোদ্দো বছর, তখন তাঁর অভিভাবকরা তাঁকে একটি সামার ক্যাম্পের জন্য মাউন্ট উইলসন অঞ্চলে পাঠান। এই পাহাড়ি অঞ্চলের অপরূপ দৃশ্য ও জঙ্গল তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি বাড়ি ফিরে তাঁর অভিভাবকদের রাজি করান যে, তিনি আগামী বছরটি স্কুলে যাবেন না, মাউন্ট উইলসন অঞ্চলটিতে থাকবেন। বস্তুত তিনি আর-কোনো দিনই স্কুলে যাননি। মাউন্ট উইলসনের পাহাড়ি অঞ্চলে তিনি মালবাহী খচ্চরের চালক হিসেবে পেশা বেছে নেন। পরবর্তী সময়ে মাউন্ট উইলসন মানমন্দির তৈরি হলে তিনি দারোয়ান হিসেবে নিযুক্ত হন। সময়ের সাথে-সাথে নিজ অধ্যবসায় বলে তিনি পৃথিবীবিখ্যাত বিজ্ঞানী হন। ১৯২৯ সালে হাবল তাঁর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার বিবরণ পেশ করেন। তিনি বলেন, বহুদূরের ছায়াপথ (Galaxy) থেকে আসা আলো, তার প্রত্যাশিত রঙের চেয়ে কিছুটা বেশি লালচে দেখাচ্ছে এবং যে-ছায়াপথ যত দূরে অবস্থিত, তার আলো তত বেশি লালচে। বেশি দূরত্বের সাথে বেশি লালচে দেখানোর সম্পর্কটি বুঝতে গেলে কয়েকটি বিষয় জানতে হবে। আমরা জানি, সূর্য থেকে যে-আলো আমরা পাই, তা আসলে সাতটি রঙের যোগফল। এই রংগুলি পর পর সাজালে আমরা যে-রঙের পটটি পাই, তাকে বর্ণালি বলে। বর্ণালির এক প্রান্তে থাকে বেগুনি আলো অন্য প্রান্তে থাকে লাল আলো। আলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় তরঙ্গ বা ঢেউয়ের আকারে। কোনো রঙের আলোর ঢেউয়ের দুটি পাশাপাশি চূড়ার মধ্যে দূরত্বকে বলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য। যে-আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বেশি, তার শক্তি তত কম। বর্ণালির এক প্রান্তে থাকা লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অন্য রঙের আলোগুলোর চেয়ে বেশি, তাই এর শক্তি সবচেয়ে কম। একইভাবে বর্ণালির অপর প্রান্তে থাকা বেগুনি রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অন্য রঙের আলোগুলোর তুলনায় সবচেয়ে

হাবল আরও বললেন, শুধু আমাদের গ্যালাক্সি থেকেই অন্য গ্যালাক্সিগুলো দূরে সরে যাচ্ছে, তা নয়, প্রতিটি গ্যালাক্সিই পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সুতরাং এই মহাবিশ্বের অতি দ্রুত প্রসারণ ঘটছে।

কম, তাই এর শক্তি সবচেয়ে বেশি। সুতরাং আলো সম্পূর্ণরূপে লালচে বা red-shifted হয়ে যাওয়ার মানে, তার শক্তি কমে যাওয়া এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়া। এই ঘটনাটিকে বলে ডপলার ক্রিয়া। ১৮৪২ সালে অস্ট্রীয় বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান জোহান ডপলার এই ক্রিয়া আবিষ্কার করেন। দ্রুত সরে যাওয়া বস্তুর আলোতে যেমন red-shift ধরা পড়ে, তেমনি দ্রুত কাছে আসা কোনো বস্তুর আলোতে নীল রঙের দিকে সরণ দেখা যায়। একে blue-shift বলে, এই ক্রিয়া শব্দের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। মোটকথা আলো, শব্দ যদি তাদের উৎস থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তাহলে কম্পাঙ্ক কমে যাবে, কাছে এগিয়ে এলে কম্পাঙ্ক বাড়বে। মোটরগাড়ি যখন আমাদের কাছে আসতে থাকে, তার হর্নের কম্পাঙ্ক বাড়তে থাকে, তখন আমরা জোরে শব্দ শুনতে পাই। দূরে গেলে হর্নের কম্পাঙ্ক ক্রমশ কমতে থাকে, শব্দ অস্পষ্ট হয়ে যায়।

হাবলের পর্যবেক্ষণ দেখাল যে, গ্যালাক্সিগুলি থেকে আসা আলোয় লাল সরণ ধরা পড়ছে। সুতরাং গ্যালাক্সিগুলি আমাদের ছায়াপথ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি আরও লক্ষ করলেন, যে-গ্যালাক্সিগুলি যত দূরে অবস্থিত, তাদের সরে যাওয়া তত বেশি দ্রুত। হাবল আরও বললেন, শুধু আমাদের গ্যালাক্সি থেকেই অন্য গ্যালাক্সিগুলো দূরে সরে যাচ্ছে, তা নয়, প্রতিটি গ্যালাক্সিই পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সুতরাং এই মহাবিশ্বের অতি দ্রুত প্রসারণ ঘটছে।

এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের কিছুদিন আগে থেকেই বিজ্ঞানীমহলে ওরকম একটা ধারণা প্রচলিত ছিল। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন, তাঁর ব্যাপক আপেক্ষিকতাবাদতত্ত্বে (General Theory of Relativity) মহাজাগতিক স্থিরাঙ্ক নামক একটি ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন। মহাজাগতিক স্থিরাঙ্ক মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে কাজ করে, এবং মাধ্যাকর্ষণের টানে সংকুচিত হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে মহাবিশ্বকে স্থিতিশীল রাখে। ১৯২২ সালে 'Zeitschrift fur physic' নামক একটি জার্মানি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আলেকজান্ডার এ ফ্রিডম্যানের একটি প্রবন্ধ। এটিতে তিনি তাঁর মহাবিশ্বের প্রসারণ সংক্রান্ত চিন্তা ব্যক্ত করেন। এর পাঁচ বছর পর ১৯২৭ সালে ব্রাসেলসের একটি পত্রিকায় (Annales de la societe Scientifique) প্রকাশিত হয় বেলজিয়ান পাদ্রি ও গণিতজ্ঞ জর্জেস লেমেতারের একটি মহাবিশ্বের প্রতিরূপ সংক্রান্ত প্রবন্ধ। যদিও সেই সময় লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল স্বল্প পরিচিত জার্নালে, তাই এ-প্রবন্ধ বেশি মানুষ লক্ষ করেননি। পরে আইনস্টাইন লেমেতারকে এক সাক্ষাতে বলেন, 'আপনার গণিত অভ্রান্ত, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান অনেকটাই কাঁচা।' পরে অবশ্য অপর একটি বক্তৃতায় আইনস্টাইন লেমেতারের কাজের প্রশংসা করেছিলেন। কী লিখেছিলেন লেমেতার?— লেমেতারের তত্ত্ব অনুযায়ী আদিতে মহাবিশ্ব একটি বিন্দুতে নির্দিষ্ট ছিল। সেই বিন্দু থেকে আরম্ভ হয়েছে বিশ্বের প্রসারণ। লেমেতার এই বিন্দুটির নাম দেন বিগব্যাঙ বা মহাবিস্ফোরণ। এই মহাবিস্ফোরণে সৃষ্টি হওয়া মহাবিশ্ব আজও প্রসারিত হয়ে চলেছে। প্রসারণের ফলে মহাবিশ্ব ক্রমশ ঠান্ডা হয়েছে।

মহাবিস্ফোরণ: যেখানে পদার্থবিজ্ঞানের আত্মসমর্পণ

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, আজ থেকে প্রায় তেরোশো আশি কোটি বছর আগে ঘটেছিল মহাবিস্ফোরণ বা বিগব্যাঙ। বর্তমানে আমরা আমাদের চোখের সামনে যে-মহাশূন্যকে দেখছি, দেখছি হাজার হাজার নক্ষত্র, ছায়াপথ, ধূমকেতু— এসবই সৃষ্টি হয়েছে মহাবিস্ফোরণ থেকে। মহাবিস্ফোরণের আগে এসব কিছুই ছিল না। ছিল না কোনো স্থান ও সময়, আমরা যখন সোজাসুজি সামনে হেঁটে যাই একটা সরলরেখা বরাবর, তাকে বলে দৈর্ঘ্য। যখন পাশাপাশি যাই, তাকে বলে প্রস্থ। যখন লাফিয়ে উঠে কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করি, তাকে বলে উচ্চতা। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা— এই তিনটি নিয়েই তৈরি হয় স্থান। আমরা যখন কোনো ঘটনাকে বর্ণনা করতে যাই, কোনো ঘটনাকে অন্য কোনো ঘটনা থেকে আলাদা করতে চাই, তখন তা করি স্থান-কালের নিরিখে। যখন আমরা বলি কাল দুপুর বারোটায় ইডেন গার্ডেন্সে ক্রিকেট ম্যাচ আছে, তখন স্থান ও কালের উল্লেখের সাহায্যে ঘটনাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। কিন্তু বিগব্যাঙ বা মহাবিস্ফোরণের আগে আর-কোনো স্থান ও সময় ছিল না। শুনতে হেঁয়ালি লাগলেও বলতে হবে ঘটনাটি আসলে কোনো স্থানে ঘটেনি, কারণ বিগব্যাঙ ঘটনার পরেই স্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং ঘটনাটি কোনো সময়ে ঘটেনি, কারণ এই সময় ছিল শূন্য। এই বিন্দুর মতো অবস্থা, যার আয়তন ছিল শূন্য ও ঘনত্ব অসীম, তাকে বলা হত সিংগুলারিটি বা অনন্যতা। বিজ্ঞানীরা বলেন, যেহেতু বিগব্যাঙের পরে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে ও সময়ের সূচনা হয়েছে, তাই বিগব্যাঙের আগে কী ছিল, তা কোনোদিন জানা যাবে না। এ যেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ।

মহাবিস্ফোরণ-পরবর্তী অবস্থা: অবয়বহীন চলচ্চিত্র

বিগব্যাঙের আগের অবস্থা জানা অসম্ভব হলেও বিগব্যাঙের পরবর্তী সময়ে কী হয়েছিল, তা কীভাবে বিবর্তিত হয়ে আমাদের বর্তমান মহাবিশ্বে রূপ পেল, এ-সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার আজ যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ ও যুক্তিসংগত। এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্টিফেন ওয়েনবার্গ তাঁর বিখ্যাত বই 'The first three minutes'-এ সৃষ্টি-পরবর্তী বিশ্বের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি যেন চলচ্চিত্রের দৃশ্যের পর দৃশ্যের মতো আমাদের দেখিয়েছেন সেই আদিম বিশ্বের রূপ। যার চরিত্রগুলো কোনো মানব মানবী নয়— বিভিন্ন কণা, শক্তি, রশ্মি ও তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। দেখা যাক, স্টিফেন ওয়েনবার্গ তাঁর এই বর্ণনায় আমাদের কী দেখান:

দৃশ্য ১: বিস্ফোরণের মুহূর্তে খুদে মহাবিশ্বের কী উপাদান ছিল, তা জানা সম্ভব নয়। তার কারণ, এই সময়কার বিশ্বের তাপমাত্রা আমাদের জানা নেই। জন্মমুহূর্তের এক সেকেন্ডের এক শতাংশ অর্থাৎ এক সেকেন্ডকে একশো ভাগে ভাগ করলে যে-সময় পাওয়া যায়, সেই মুহূর্তটিতে বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল 10^{11} ^{o}k বা দশ হাজার কোটি ডিগ্রি কেলভিন।

এ-অবস্থায় মহাবিশ্বের গঠন ছিল একেবারে সরল। মহাবিশ্ব ছিল বস্তুকণা (matter) ও বিকিরণ বা রশ্মিকণার একটি অতি ঘন ঝোলের মতো। সহজ উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, এ-গঠন ছিল অনেকটা খিঁচুড়ির মতো। এই অতি ঘন ঝোলের মধ্যে কণাগুলি নিজেদের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ ঘটাচ্ছিল। এদের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছিল অতি দ্রুত। এ-কারণেই দ্রুত প্রসারিত হলেও মহাবিশ্বের সর্বত্র একটা তাপীয় সাম্য অবস্থা (Thermal equilibrium) বজায় ছিল।

ফোটন ছাড়া এই খুদে মহাবিশ্বে কী ধরনের বস্তুকণা উপস্থিত ছিল? রশ্মিকণা যেসব বস্তুকণা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নূন্যতম তাপমাত্রা (Threshold temperature) 10^{11} ^{o}k-এর কম। এই বস্তুকণাগুলি হল ইলেকট্রন ও এর অ্যান্টি-পার্টিকেল পজিট্রন। অ্যান্টি-পার্টিকেল হল এমন একটি কণা, যার ভর ও চার্জ কোনো নির্দিষ্ট একটি কণার (যেমন— ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি) সম্পূর্ণ বিপরীত। একটি কণা তার বিপরীত কণার সংস্পর্শে এলে সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও অদৃশ্য হয়ে যায়।

পড়ে থাকে শুধু শক্তি। সৃষ্টির শুরুতে কণারূপে ইলেকট্রন, পজিট্রন ছাড়াও ছিল ভূতুড়ে ভরহীন কণা। নিউট্রিনো ও তার বিপরীত কণা অ্যান্টি-নিউট্রিনো।

নিউট্রিনোকে ভূতুড়ে বা spooky বলা হয়, কারণ এর সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা বাকি। নিউট্রিনো আলোর গতিবেগে চলে এবং অনায়াসে পৃথিবীকে ভেদ করে চলে যায়। (বিজ্ঞানীরা বলেন, নিউট্রিনোকে আটকাতে পারে ছেচল্লিশ আলোকবর্ষ পুরু কোনো সিসার পাত।) কিন্তু এই সময় মহাবিশ্ব এত অসম্ভব ঘন ছিল যে, নিউট্রিনোরাও এই রশ্মিকণা ফোটন ও বস্তুকণা ইলেকট্রন ও পজিট্রনের জমাট জালে আটকে পড়ে। সারাক্ষণ তাদের সঙ্গে ও নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খেতে থাকে। এই পর্যায়ে মহাবিশ্বের ঘনত্ব কত ছিল? দেখা গেছে, মহাবিশ্ব যদি শুধু রশ্মিকণা ফোটন দ্বারা তৈরি হত, তাহলে যা ঘনত্ব হত, ঘনত্ব ছিল তার ৪.৫ গুণ। স্টিফান বোলজম্যান সূত্র অনুসারে 10^{11} ^{o}k তাপমাত্রায় তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের শক্তি ঘনত্ব হল 4.72×10^{44} ইলেকট্রন ভোল্ট প্রতিলিটার। সুতরাং $(4.5 \times 4.72 \times 10^{44}) = 21 \times 10^{44}$ইলেকট্রন ভোল্ট প্রতিলিটার হল সেই সময়কার মহাবিশ্বের ঘনত্ব, যা জলের ঘনত্বের চারশো কোটি গুণ। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, যদি মাউন্ট এভারেস্ট এই ঘনত্বের পদার্থ দিয়ে তৈরি হত, তাহলে তার মহাকর্ষীয় টানে পৃথিবী সঙ্গে-সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যেত।

এই দৃশ্যে আমরা দেখতে পাব মহাবিশ্ব অত্যন্ত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে ও শীতল হচ্ছে। এই প্রসারণ হার মহাবিশ্বের প্রতিটি অংশের মুক্তিবেগের সমান ছিল। এই আদি মহাবিশ্বে 'অল্প সংখ্যক' (আসলে অগণ্য কোটি) নিউক্লিয়ো পদার্থ অর্থাৎ প্রোটন ও নিউট্রনও উপস্থিত ছিল। অনুপাত ছিল প্রতি একশো কোটি ফোটন বা ইলেকট্রন-পজিট্রন বা নিউট্রিনো-অ্যান্টি-নিউট্রিনোপিছু একটি করে প্রোটন ও নিউট্রন। নিউট্রন ও প্রোটনগুলির সঙ্গে ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো ও অ্যান্টি-নিউট্রিনোগুলোর ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে প্রোটনগুলি অনবরত নিউট্রনে ও নিউট্রনগুলি অনবরত প্রোটনে রূপান্তরিত হতে লাগত। আদি মহাবিশ্বে স্থির অবস্থা তখনই এল, যখন নিউট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান হয়ে গেল।

আমরা জানি নিউট্রন ও প্রোটন মিলে জোড় তৈরি করে পরমাণুর নিউক্লিয়াস। কিন্তু আদি বিশ্বে প্রচণ্ড তাপের দরুন পরমাণুর নিউক্লিয়াস তৈরি হলেও, তা প্রচণ্ড চাপ ও তাপের জন্য ভেঙে যেতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত বলা যায়, প্রচণ্ড ঘনত্ব সত্ত্বেও বিস্ফোরণ-বেগের তাড়নায় বিশ্বের আয়তন ক্রমশ বেড়েই যেতে থাকল, এবং সেই হারে বিশ্বের তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে লাগল।

দৃশ্য ২: মহাবিশ্বের তাপমাত্রা এখন তিন হাজার কোটি ডিগ্রি কেলভিন। জন্মের পর কেটে গেছে ০.১১ সেকেন্ড, এখনও মহাবিশ্বের গঠনে কোনো পরিবর্তন হয়নি। সব জায়গাতেই সমান উত্তপ্ত অসম্ভব ঘন এক কণা-ঘুঘনি। মহাবিশ্বে এখনও প্রধান উপাদানগুলি হল— ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রিনো, অ্যান্টি-নিউট্রিনো এবং ফোটন। মহাবিশ্বের ঘনত্ব আগের থেকে কমলেও এখনও এর ঘনত্ব জলের তিন কোটি গুণ। খুব অল্প সংখ্যায় প্রোটন ও নিউট্রন যুক্ত হয়ে নিউক্লিয়াস গঠন করলেও এটাই প্রধান ঘটনা ছিল না। বরং তাপমাত্রা আরেকটুকু কমার সঙ্গে-সঙ্গে নিউট্রনগুলি প্রোটনে ও প্রোটনগুলি নিউট্রনে রূপান্তরিত হতে থাকল। নিউট্রন প্রোটনের চেয়ে সামান্য ভারী। তাই এই পরিবর্তনের সময় নিউট্রনগুলি একটু বেশি তাড়াতাড়ি প্রোটন হয়ে যেতে লাগল। ফলে নিউট্রন প্রোটনের শতকরা পরিমাণ ৫০-৫০ শতাংশ থেকে দাঁড়াল যথাক্রমে ৩৮ ও ৬২ শতাংশ।

দৃশ্য ৩: তাপমাত্রা এখন এক হাজার কোটি কেলভিন। মহাবিস্ফোরণের পর ১.০৯ সেকেন্ড সময় কেটে গেছে। এই তাপমাত্রা হ্রাসের ফলে জমাট ঝোলে জড়ানো অবস্থা থেকে নিউট্রিনোরা মুক্তি পেয়ে মুক্ত কণার মতো বেরিয়ে আসতে লাগল। এই সময় থেকে আমাদের মহাবিশ্বের গঠনচিত্রে নিউট্রিনোদের আর-কোনো ভূমিকা রইল না। শুধুমাত্র তারা মহাবিশ্বের মহাকর্ষ ক্ষেত্র গঠনে সাহায্য করতে লাগল। মহাবিশ্বের ঘনত্ব এখন অনেকটাই কম, তার ঘনত্ব জলের তিন লক্ষ আশি হাজার গুণ। তাপমাত্রা আরও কমতে থাকলে নিউট্রনগুলি প্রোটনের চেয়ে আরও দ্রুত বেগে রূপান্তরিত হওয়ায় নিউট্রন ও প্রোটনের অনুপাত দাঁড়াল যথাক্রমে ২৪ ও ৭৬ শতাংশ। কিন্তু তাপ এখনও এত বেশি যে নিউট্রন ও প্রোটন জুড়ে এখনও নিউক্লিয়াস গঠন সম্ভব নয়।

দৃশ্য ৪: মহাবিশ্বের তাপমাত্রা এখন তিনশো কোটি ডিগ্রি কেলভিন (3×10^{o}k)। মহাবিস্ফোরণের পর ১৩.৮২ সেকেন্ড সময় কেটে গেছে। কিন্তু তাপ আর ইলেকট্রন-পজিট্রন সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই তাপমাত্রা ইলেকট্রন-পজিট্রনের threshold temperature-এর চেয়ে কম। তাই এরা ক্রমশ মহাবিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আর রইল না। আগেকার বেশি তাপের পর্যায়ে ইলেকট্রন-পজিট্রনের অবিরাম সংঘর্ষের ফলে দু-রকম কণাই ধ্বংস হয়ে আলোর কণা ফোটনে পরিণত হচ্ছিল। আবার ঠিক উলটোভাবে এই ফোটনগুলি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়ের সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু এখন এই কণাগুলো আর সৃষ্টিই হচ্ছে না, তাই যে ইলেকট্রন ও পজিট্রনগুলি রয়েছে, তারা সারাক্ষণ পরস্পরকে ধ্বংস করে চলেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিউট্রিনো, অ্যান্টি-নিউট্রিনো, ইলেকট্রন, পজিট্রন সবাই হারাধনের ছেলেদের মতো একে একে নিখোঁজ হয়ে গেল। সুতরাং বাকি রইল ফোটন। তাই এখন থেকে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা বলতে বোঝাবে শুধুমাত্র ফোটন।

এই তিনশো কোটি ডিগ্রি তাপে হিলিয়ামের মতো সুস্থির নিউক্লিয়াস গঠন সম্ভব হলেও, তা সঙ্গে-সঙ্গে হল না। এর কারণ মহাবিশ্ব যে-গতিতে প্রসারিত হচ্ছিল, নিউক্লিয়াস গঠনের জন্য প্রয়োজন খুব দ্রুত কণাদের মুখোমুখি ধাক্কা। এই ধাক্কাগুলিকে বলে two-particle reactions এবং এটি পর পর কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। যেমন একটি প্রোটন ও নিউট্রন জুড়ে গিয়ে ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম তৈরি করে। এই ডয়টেরিয়াম নিউক্লিয়াস একটি প্রোটন বা নিউট্রনের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে তৈরি করে হালকা হিলিয়াম আইসোটোপ (He^3) বা হাইড্রোজেনের ভারীতম আইসোটোপ ট্রিটিয়াম (H^3)। শেষ পর্যন্ত হিলিয়াম আইসোটোপ (He^3) একটি নিউট্রন বা ট্রিটিয়াম (H^3) একটি প্রোটনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তৈরি করতে পারে সাধারণ হিলিয়াম (He^4), যা দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন দ্বারা তৈরি

নিউক্লিয়াস। কিন্তু এই যে পর পর বিক্রিয়ার শৃঙ্খল, এটা সম্পূর্ণ হতে সবার প্রথমে প্রয়োজন ডয়টেরিয়াম তৈরি হওয়া। কিন্তু মুশকিল হল, ডয়টেরিয়াম তৈরি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওই তিনশো কোটি ডিগ্রি তাপ তাকে আবার ভেঙে দিচ্ছিল। সুতরাং ডয়টেরিয়াম না সৃষ্টি হওয়ার ফলে হিলিয়াম-৪ নিউক্লিয়াস তৈরি হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এই বাধাটিকে বলা হয় ডয়টেরিয়াম প্রতিবন্ধক (Deuterium bottleneck)। তাপ আর-একটু কমলে নিউট্রনের রূপান্তরের হার আর-একটু বেড়ে গিয়ে নিউট্রন ও প্রোটনের পরিমাণ দাঁড়াল যথাক্রমে ১৭ ও ৮৩ শতাংশের মতো।

দৃশ্য ৫: মহাবিশ্বের তাপমাত্রা এখন একশো কোটি কেলভিন। এই তাপমাত্রা সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রার প্রায় সত্তর গুণ। মহাবিস্ফোরণের পর কেটে গেছে তিন মিনিট দুই সেকেন্ড। অধিকাংশ ইলেকট্রন ও পজিট্রন পরস্পরকে ধ্বংস করতে করতে রশ্মিতে বা ফোটনে পরিণত হয়েছে। ফলে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা যতটা কমার কথা ছিল ততটা কমেনি।

মহাবিশ্বের তাপমাত্রা কমলেও তখনও ডয়টেরিয়াম প্রতিবন্ধক হিলিয়াম গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। নিউট্রন ও প্রোটনদের সঙ্গে ইলেকট্রন, নিউট্রিনো ও অ্যান্টি-নিউট্রিনোদের সংঘর্ষ বন্ধ হলেও পরিস্থিতি এমন সংকটময় হয়ে উঠল যে, কিছুক্ষণের মধ্যে নিউট্রন অবশিষ্ট না থাকলে হিলিয়ামও তৈরি হবে না। প্রতি একশো সেকেন্ডে অবশিষ্ট নিউট্রনের ১০ শতাংশ প্রোটনে রূপান্তরিত হচ্ছিল। নিউট্রন-প্রোটন অনুপাত এখন যথাক্রমে ১৪ ও ৮৬ শতাংশ।

এবার আমরা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে চলে এসেছি, যাকে বলে ক্লাইম্যাক্স। তাপমাত্রা আর-একটু কমে এমন একটি পর্যায়ে এল, যখন আর ডয়টেরিয়াম প্রতিবন্ধকটি রইল না। two-particle reactions-এর শৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় এখন ভারী সুস্থিত নিউক্লিয়াস গঠন সম্ভব। দ্রুত গতিতে প্রথমে ডয়টেরিয়াম গড়ে উঠতে লাগল। তার সঙ্গে আর-একটি নিউট্রন জুড়ে তৈরি হল আরও ভারী হাইড্রোজেন ট্রিটিয়াম (H^3)। তারপর আরও একটি নিউট্রন জুড়ে তৈরি হল হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। এই অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির কিছুক্ষণ পরেই এই মহাজাগতিক ঝোলের মধ্যেকার অবশিষ্ট নিউট্রনগুলি তাপীয়-নিউক্লিয়ো প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হল। এই প্রক্রিয়ার আগে নিউট্রন ছিল প্রায় ১৩ শতাংশ ও প্রোটন ছিল ৮৭ শতাংশ। সুতরাং ওই ১৩ শতাংশ নিউট্রনের সবাই যদি হিলিয়ামে পরিণত হয়, তাহলে ওজন হিসেবে চার-কণা-বিশিষ্ট হিলিয়ামের পরিমাণ হবে (১৩×২)=২৬ শতাংশ এবং এক-কণা-বিশিষ্ট হাইড্রোজেন হবে ৭৪ শতাংশ। কিন্তু হিলিয়ামের থেকে বেশি ভরের কোনো উপাদান (কার্বন ও অক্সিজেন) আদি মহাবিশ্বে তৈরি হল না। কারণ সব নিউট্রনই হিলিয়াম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে গিয়েছিল। সৃষ্টির এই আদি মুহূর্তে পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন ডয়টেরিয়াম, He^3, He^4— এই পর্যন্তই এগোতে পেরেছিল। তাই হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামই আমাদের মহাবিশ্বের আদি উপাদান।

পরে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা আরও কমে গেলে ইলেকট্রন-পজিট্রনের পরস্পরকে ধ্বংসের খেলা পেরিয়ে টিকে থাকা অল্প সংখ্যক ইলেকট্রন হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম নিউক্লিয়াসগুলোর সঙ্গে জুড়ে আধান বা চার্জহীন পরমাণু গঠন করতে লাগল। এভাবে সৃষ্টি হল বস্তু গঠনের প্রক্রিয়া, কারণ আমরা জানি কোনো বস্তুর প্রাথমিক কণা হল পরমাণু। এই সময় থেকেই বিশ্বজগতের সুপের মতো অবস্থাটি শেষ হল এবং বস্তুকণা ও রশ্মিকণাগুলো একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে গেল। বিশ্ব হয়ে উঠল বস্তুময়। বিশ্ব বস্তুময় হয়ে ওঠার পর থেকেই বস্তুদের মধ্যে দেখা দিল মাধ্যাকর্ষণের টান, ফলে বস্তু ক্রমে ঘন হতে হতে গ্যালাক্সি, নীহারিকা এসব তৈরি করতে লাগল। নক্ষত্রগুলির ভেতর প্রচণ্ড চাপ ও তাপে ক্রমাগত ভারী মৌলগুলি উৎপন্ন হতে লাগল।

সবকিছুই নক্ষত্রের ধুলো

বিজ্ঞানী কার্ল সাগানের মন্তব্য অনুযায়ী আমরা সবাই নক্ষত্রের ধুলো থেকে তৈরি। দেখা যাক, এর কী উত্তর আমরা খুঁজে পাই। যখন হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু তৈরি হল, মহাবিশ্ব খুব দ্রুত প্রসারিত হতে ও ঠান্ডা হতে শুরু করল। প্রায় কুড়ি কোটি বছর পর তাপমাত্রা যথেষ্ট কমে এল। বস্তুকণাদের মধ্যে শক্তির বিকিরণও কমে এল যথেষ্ট পরিমাণে। অভিকর্ষ বলের মান বাড়তে লাগল এবং হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু পুঞ্জে পুঞ্জে জমা হতে লাগল। এই পুঞ্জীভূত বস্তুকণারা মহাবিশ্বে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবেই সৃষ্টি হল ছায়াপথ বা গ্যালাক্সিগুলো। গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে নিদারুণ আকর্ষণের ফলে ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বস্তু জমা হতে লাগল ও নিউক্লিয়ো ফিউশন বা নিউক্লিয়ো সংযোজন প্রক্রিয়া শুরু হল। নিউক্লিয়ো ফিউশন হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যাতে হালকা পরমাণুগুলি প্রবল তাপ ও চাপে পরস্পর পিষে গিয়ে তৈরি করে ভারী নিউক্লিয়াস। সূর্যের মধ্যেও এইভাবেই চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু একসাথে জুড়ে গিয়ে তৈরি করে হিলিয়াম পরমাণু এবং মুক্ত করে প্রচুর তাপ। এই তাপীয় বিকিরণই সূর্যের আলো হিসেবে আমাদের চোখে আসে। যাই হোক, এইরকম উত্তপ্ত পুঞ্জীভূত পরমাণুগুলো থেকে তৈরি হয়েছিল মহাবিশ্বের প্রথম তারাগুলি। পরবর্তী দশ কোটি বছরে দেখা গেল এই তারাগুলির মধ্যে কিছু তারা তাদের মধ্যেকার সমস্ত হাইড্রোজেন নিঃশেষ করে হিলিয়ামে পরিণত করেছে এবং হিলিয়াম থেকে তৈরি করে চলেছে কার্বন ও হাইড্রোজেন। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলগুলি তৈরি হওয়ার সময় যথেষ্ট তাপ উৎপন্ন হয়নি। এবং মহাকর্ষের আকর্ষণের চাপ, যা বস্তুকে সংকুচিত করতে চায়, তা তাপীয় নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার ফলে বাইরের দিকে প্রসারিত হওয়ার চাপের থেকে বেশি হয়ে ওঠে। অন্তিম পর্যায়ে তারাগুলি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। এই ঘটনাকে বলে সুপারনোভা। সুপারনোভা মহাবিশ্বে ভারী মৌলগুলিকে ছড়িয়ে দেয়। এই ভারী মৌলগুলি বিভিন্ন ছায়াপথে আটকে পড়ে ক্রমে জমাট বেঁধে গ্রহদের রূপ পায়। আমাদের পৃথিবীও এরকম কোনো আদি নক্ষত্র-বিস্ফোরণের ফল। এই নক্ষত্ররাই গ্রহদের তাপ এবং আলো দেয়। আমাদের পৃথিবীও সূর্যের কাছে এভাবে ঋণী। তাই বলা যায়, আমরা সবাই এক-কথায় নক্ষত্রের ধুলো।

শতাব্দীর সেরা রহস্যকাহিনি

বিগব্যাঙ তত্ত্ব আবিষ্কারের পর অনেকেই এ-ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ

করেছিলেন। অনেকে বলেন, এর মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের 'Creation ex nihilo' ধারণার ছায়া আছে। 'Creation ex nihilo'-র অর্থ হল নাস্তি বা শূন্য থেকেই সকল সৃষ্টি রূপ পেয়েছে। তাই অনেক বিজ্ঞানী বিগব্যাঙ মতবাদকে স্বীকৃতি দিতে চাননি। এরপরে বিজ্ঞানীরা অনেকভাবে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। উঠে এসেছে Steady State Theory বা স্থির বিশ্বজগৎ মতবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী বিশ্ব কোনো নির্দিষ্ট সময় সৃষ্টি হয়নি, তা চিরকালই একই রূপে ছিল। মহাবিশ্ব ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে এবং প্রসারণের ফলে এর মাঝে যে-স্থান তৈরি হচ্ছে, সেখান থেকে নতুন পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং মহাবিশ্ব হল শাশ্বত, এর কোনো নির্দিষ্ট জন্মমুহূর্ত নেই। আরেকটি তত্ত্ব হল মহাবিশ্বের Oscillatory Model of Universe। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার পর, তা ক্রমশ প্রসারিত হতে হতে এক সময় সংকুচিত হতে শুরু করে ও এক সময় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে শূন্যে পরিণত হয়। একে বলা হয় Big Crunch। আবার এই শূন্য থেকে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে হতে বড়ো হতে থাকে। এরকমভাবে ক্রমাগত চলতে থাকে সৃষ্টি ও ধ্বংসের খেলা। কিন্তু সব মতবাদকে নস্যাৎ করে শেষ পর্যন্ত বিগব্যাঙ তত্ত্বই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে দৃঢ় আসনে। কীভাবে? সে-কাহিনি যেন রোমহর্ষক গোয়েন্দা কাহিনিকেও হার মানায়।

আমরা আগেই জেনেছি, মহাবিশ্ব আদি সময়ে ছিল অত্যন্ত ঘন এক অবস্থায়, যাকে বলা হত কসমিক সুপ। এর তাপমাত্রা ও ঘনত্ব ছিল অকল্পনীয়। যার মধ্যে বস্তুকণা ও আলোকণা ফোটন সারাক্ষণ সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। ফলে বস্তু ও শক্তির এই মিশ্রণের সর্বত্রই সমান তাপমাত্রা বজায় ছিল। একে বলা হয় তাপীয় সাম্য অবস্থা বা thermal equilibrium। কোনো জিনিসের সমস্ত অংশে তাপমাত্রা সমান থাকলে, তার সব দিক থেকে সমানভাবে শক্তির বিকিরণ ঘটবে। একে বলে Black Body Radiation বা কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ। এই Black Body-র কোনো বিশেষ অবস্থার তাপমাত্রাই স্থির করে দেবে, তা থেকে যে-রশ্মিগুলি নির্গত হবে, তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কীরকম হবে।

সুপারনোভা মহাবিশ্বে ভারী মৌলগুলিকে ছড়িয়ে দেয়। এই ভারী মৌলগুলি বিভিন্ন ছায়াপথে আটকে পড়ে ক্রমে জমাট বেঁধে গ্রহদের রূপ পায়। আমাদের পৃথিবীও এরকম কোনো আদি নক্ষত্র-বিস্ফোরণের ফল।

বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামোর ধারণা হয়েছিল যে, বিগব্যাঙের পর সৃষ্টি হওয়া আদি উত্তপ্ত মহাবিশ্বের কসমিক সুপ অবস্থা ছিল একটি ব্ল্যাক বডির মতো, কারণ, অকল্পনীয় ঘনত্বের জন্য তার সব জায়গায় তাপমাত্রা ছিল সমান। বিগব্যাঙের উঁচু কম্পাঙ্কের শক্তি বিশ্বের প্রসারণের ফলে নীচু কম্পাঙ্কের শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এই শক্তির কম্পাঙ্ক মাইক্রোওয়েভের মতো হওয়া সম্ভব। $\frac{১}{১০০}$ সে.মি. থেকে ১০ সে.মি. দৈর্ঘ্যের রশ্মিকে Microwave Radiation বলে। গ্যামো হিসেব করে বলে দিলেন, আদি বিশ্বজগতের সেই বিকিরণের অবশেষের বর্তমান সময়ে তাপমাত্রা হবে পঞ্চাশ কেলভিন। পরে তার সহযোগী র‍্যালফ আলফার ও রবার্ট হারম্যান গ্যামোর গণনায় দু-একটি ত্রুটি সংশোধন করে দেখালেন, এই বিকিরণের উষ্ণতা হবে পাঁচ ডিগ্রি কেলভিন। এ যেন গোয়েন্দা কাহিনির তদন্তসূত্র, যা ছড়িয়ে আছে মহাবিশ্বে, যাকে অনুধাবন করে গোয়েন্দা পৌঁছে যাবেন অজানা গন্তব্যে।

১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে এইরকম একটা অতি নিম্ন তাপমাত্রার সর্বব্যাপী রশ্মির সন্ধান করছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন তাঁদের কাছে খবর এল নিউ জার্সির ক্রাফোর্ড হিল অঞ্চলের Telephone Labarotory কোম্পানির গবেষণাগারে আরনো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন নামে দু-জন রেডিয়ো জ্যোতির্বিজ্ঞানী টেলিস্কোপ নিয়ে কাজ করার সময় মহাকাশের সর্বত্র এমন একটি তরঙ্গের সন্ধান পাচ্ছেন, যার গড় উত্তাপ তিন ডিগ্রি কেলভিনের মতো। বিজ্ঞানীদের মধ্যে শিহরন জেগে উঠল। তবে কি রহস্যের সমাধান হল, শনাক্ত করা গেল সেই পরম গোপনীয়কে? তবু তাঁরা নিশ্চিত হলেন না। বিভিন্ন দেশে রেডিয়ো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা চলতে লাগল। দশ হাজার ভাগের এক ভাগ সূক্ষ্মতায় উষ্ণতা মেপে দেখা গেল, তরঙ্গটির সঠিক তাপমাত্রা ২.৭° কেলভিন বা -২৭০.৩° সেলসিয়াস।

কোথা থেকে এল এই বিকিরণ। বিজ্ঞানীরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে নিলেন, এ সেই গ্যামো ও তাঁর সহকর্মীদের প্রকল্পিত তরঙ্গ, যা বিগব্যাঙের পর মহাবিশ্ব ক্রমাগত প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে উত্তাপ হারিয়ে ফেলেছে। যদিও পেনজিয়াস ও উইলসন প্রথমে তাঁদের আবিষ্কারের মর্ম বুঝতে পারেননি, তবুও এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ১৯৭৮ সালে দুজনেই পান নোবেল পুরস্কার। বিজ্ঞানে এরকম হঠাৎ করে পাওয়া আবিষ্কারের নজির কম নয়। এভাবেই যেন সমাধান হল জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহস্যের। প্রাথমিক এক মহাবিস্ফোরণেই জন্ম হয়েছিল এই মহাবিশ্বের, এ যেন কবি উইলিয়াম ব্লেকের ভাষায়: 'To see a world in a grain of sand/And a heaven in a wild flower/Hold Infinity in the palm of your hand/And Eternity in an hour.' ■

ইসলামে যেমন সুফিতত্ত্ব, দেশে-দেশে নানা ধর্মে তেমনই মরমিয়া তত্ত্বের দেখা আমরা পাই। এক মরমিয়া তত্ত্বের সঙ্গে আর-এক তত্ত্বের মিশ্রণ জন্ম দেয় নতুন ভাবের, নতুন দর্শনের। ভারতীয় সুফি-ভাবনার প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে রবীন্দ্রকাব্যে? লিখেছেন

আবুল হাসনাত

রবীন্দ্রনাথের গানে সুফি-ভাবনা

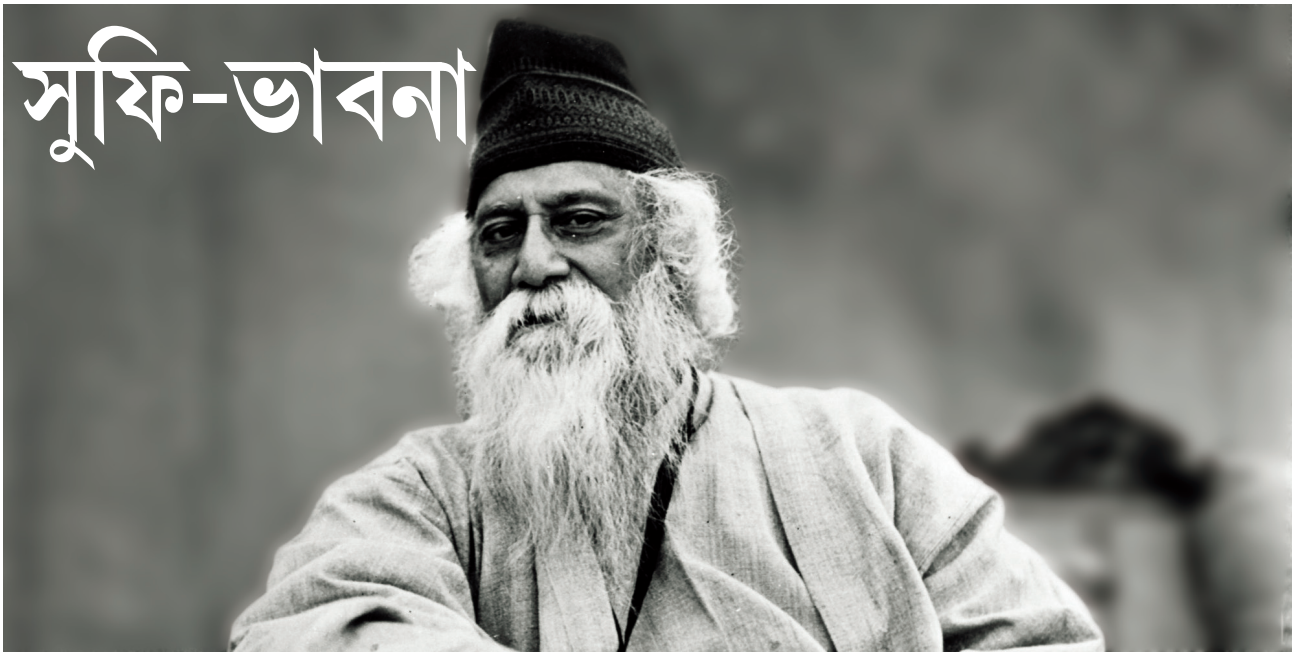

ভারতের জাগ্রত বিবেক এবং ভারতীয় আত্মার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথ ভারতের সমগ্র মিশ্র সংস্কৃতিকে তাঁর চিত্তের উদার প্রাঙ্গণে বরণ করে প্রেম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। যেমন ধর্ম ও ধর্মব্যবস্থা এবং দর্শন, তেমনি সাহিত্য— মননের বিভিন্ন স্তরে তাঁর এই মুক্ত চিন্তার পরিচয় আমাদের মুগ্ধ করে, প্রাণিত করে, উদারতর উপলব্ধির প্রান্তে আমরা উত্তীর্ণ হই। ভারতীয় সাহিত্যে আশ্রিত প্রায় সব ধর্ম-ভাবনার মধ্যেই ছিল তাঁর সপ্রেম মগ্নতা। আমি এখানে সুফি-ভাবনা এবং সুফি কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুধ্যান এবং নিজ কাব্যে ও গানে তার প্রতিধ্বনি— এই নিয়ে কিছু বিনীত নিবেদন রাখতে চাই।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল সজীব এবং সচল। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্য এবং তাঁর হাফেজ-অনুরাগ রবীন্দ্রনাথকেও ফারসি কাব্যের মর্মমূলে প্রবেশ করতে সহায়তা করেছিল। সেজন্য ফারসি কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তাতে তাঁর পিতার অবদান অনস্বীকার্য। আর সেই জন্যেই ফারসি কাব্যের প্রতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগের প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে আমাদের পরিচয় একান্ত জরুরি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সুফি কাব্যের, বিশেষ করে হাফেজের কাব্যের পরম ভক্ত ছিলেন। এ-বিষয়ে শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার চক্রবর্তীর দেবেন্দ্র-জীবনী ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে অনেক আলোচনা আছে। এ ছাড়াও ওই গ্রন্থের শেষে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর মনোজ্ঞ আলোচনা ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও হাফেজ’ গ্রন্থটির এক মূল্যবান সংযোজন। মহর্ষির সারা জীবনের মনন ও অনুভূতির কোন স্থানে হাফেজের অবস্থান, তা উপলব্ধি করতে হলে ওই প্রবন্ধটি পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন।[১] ওই প্রবন্ধের স্থানে স্থানে হাফেজের গজলের বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। তার অনেকগুলি পাঠ করে ভাবের গভীরতম প্রদেশে যদি পৌঁছোনো যায়, তাহলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’-পর্বের বহু কবিতার অন্দরমহলে কীভাবে তাঁর পিতার হাত ধরে হাফেজ এসে প্রবেশ করছেন, এবং কীভাবে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর আসন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ‘আত্মজীবনী’তে (একচল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত) নয় বার হাফেজের গজলের উদ্ধৃতি দিয়েছেন— মূল ফারসি হরফে এবং বাংলা অর্থসহ।[২] জীবনের অনেক গভীর মুহূর্তে তিনি হাফেজের গজলের চরণ উচ্চারণ করে নিজের অবস্থার বিবরণ দিতেন।

আসলে দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বর-অনুসন্ধানের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় ছিল, যারা পরস্পরের পরিপূরক। উপনিষদের জ্ঞান-কেন্দ্রিক ঈশ্বর-ভাবনা তাঁকে সব সময় তৃপ্ত করতে পারত না। তাই তিনি সুফি কাব্যের মরমি প্রেমের

ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। উপনিষদে প্রেমের কোনো স্থান নির্দিষ্ট করা ছিল না— তাই প্রেমের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান বিরহ থেকে জাত জ্বালা ও সন্তাপের কোনো পরিচয় সেখানে মেলে না (এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি, প্লেটোর দর্শনেও প্রেমের কোনো স্থান ছিল না। সেখানে বুদ্ধি ও যুক্তির প্রাধান্য ছিল বলেই পরবর্তীকালে ইতালির মহাকবি দান্তের এবং তাঁর অনেক পরে শেলির প্লেটোনিজম মূল প্লেটোনিক দর্শন থেকে কিছুটা ভিন্ন। দান্তে ও শেলির কাব্যে প্লেটোর বুদ্ধির স্থান দখল করেছিল প্রেম। বিখ্যাত গ্রিক পণ্ডিত নটো পুলোস শেলির প্লেটোনিজম আলোচনা প্রসঙ্গে এ-কথা উল্লেখ করেছেন)।[২ক] ঠিক এই কারণে দেবেন্দ্রনাথ প্রেমের এত কাঙাল ছিলেন। সেই প্রেম তিনি বিশেষ করে হাফেজের কাব্যে লাভ করেছিলেন। (সেই প্রেম তিনি রুমির কাব্যেও লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেইভাবে রুমির কথা উল্লেখ করেননি)। হাফেজের 'দিওয়ানে' তিনি একেবারে মস্‌ত ছিলেন। আর উপনিষদের মতো বৈষ্ণব কাব্যেও (যেখানে প্রেমের ভূমিকা অপরিসীম) তাঁর পূর্ণ তৃপ্তি ঘটেনি।[৩] ড. শহীদুল্লাহ তাঁর 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' গ্রন্থের ভূমিকায় এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন: 'বৈষ্ণব ধর্মমত ও পদাবলী আমার পিতার হৃদয়কে অধিকার করে নাই; সে কথা আমি জানি। তাঁহার রসবোধের সখা ছিলেন হাফেজ। তিনি নিজে কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছিলেন হাফেজের গানে। উপনিষদ তাঁহার ক্ষুধা মিটাইত; আর হাফেজ তাঁহার তৃষ্ণা দূর করিয়াছিল।'[৪] এভাবেই মহাকবি হাফেজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্তরকে নানা দিক দিয়ে পরিব্যপ্ত করে রেখেছিলেন। আর এভাবেই তাঁর হাত ধরে রবীন্দ্রনাথ হাফেজের কাব্যের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছিলেন। সে-পরিচয় যেমন বিচিত্র, তেমনি গভীর, যা সমগ্র 'গীতাঞ্জলি'-পর্বকে রসসমৃদ্ধ করে রেখেছিল।

ফারসি কাব্যের মরমি ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু গানের গভীর সাদৃশ্য আছে। এ-কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর অস্থায়ী ইরান বাসকালে বিভিন্ন বক্তব্যে ইঙ্গিত করেছেন। ইসফাহানে অনেক গুণীজনের সমাবেশে রবীন্দ্রনাথ বললেন, তিনি মনে করেন তিনি জন্মসূত্রে একজন ইরানি, এসেছেন তাঁর প্রাচীন বাসভূমিতে। তাঁর নিজের কথায়: 'আপনাদের পূর্বতন সুফীসাধক কবি ও রূপকার যাঁরা, আমি তাঁদেরই আপন, এসেছি আধুনিক কালের ভাষা নিয়ে। তাই আমাকে স্বীকার করা আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে না।'[৫] মওলানা জিয়াউদ্দীন শান্তিনিকেতনে ইসলামি বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে বৃত ছিলেন। তিনি তাঁর 'সদ্‌বন্দ্‌-ই-তাগোর'[৬] গ্রন্থে (রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করে একশোটি কবিতার ফারসি অনুবাদের সংকলন) 'গীতাঞ্জলি'র যে-বত্রিশটি কবিতার ফারসি অনুবাদ করেছেন, সেগুলিকে, যাঁর ফারসি সেভাবে জানা নেই এবং ওই ফারসি রচনাগুলি যে রবীন্দ্র-কবিতার ফারসি অনুবাদ, সেটাও জানা নেই, তাঁর মনে হবে কোনো ফারসি সুফি কবির রচনা। অবশ্য কোনো কোনো বাংলা শব্দের ফারসি রূপ দান করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়:

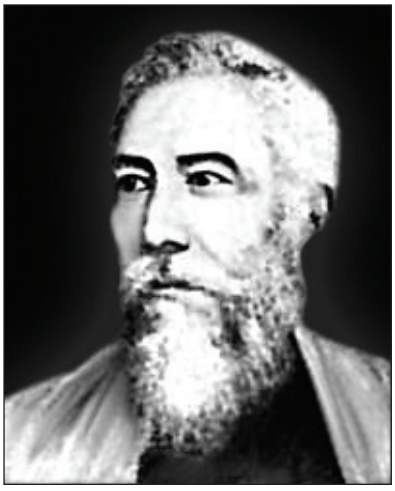

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।

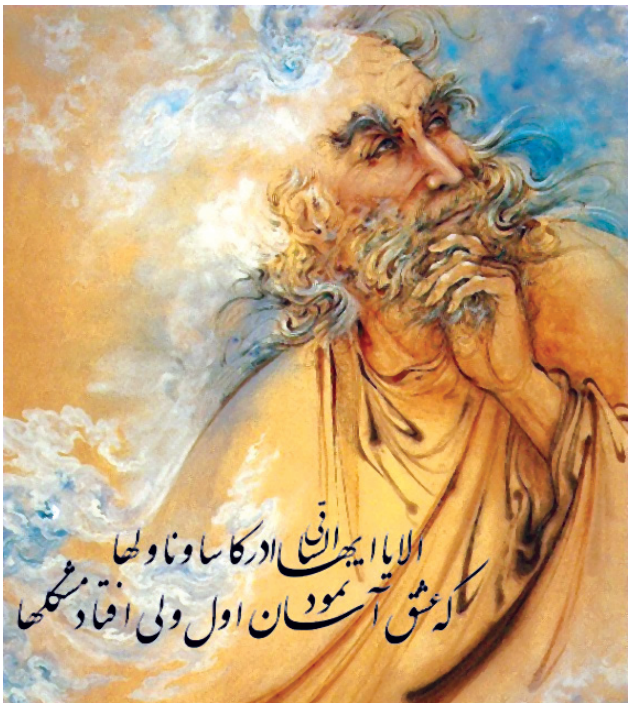

ফারসি কবি হাফেজ।

এর ফারসি অনুবাদ করা হল এইভাবে:

জানে মন!
দর ইঁ শাব-ই-তুফানি দর ইনতিজার-ই-তু ব-নাশেস্‌তাআম!

এখানে প্রেমিকার 'অভিসারে'র কোনো ফারসি প্রতিশব্দ নেই, থাকা সম্ভবও নয়। তার বদলে প্রেমিকার অনন্ত প্রতীক্ষা বোঝানোর জন্য 'ইনতিজার' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার ফলে সমগ্র ফারসি অনুবাদে অভিসারের কষ্টের চেয়ে ইনতিজারের বেদনাই ফুটে উঠেছে বেশি। 'ইনতিজার' তো 'অভিসারে'র প্রতিশব্দ নয়। 'ইনতিজার' খুব সুন্দর কাব্যিক শব্দ— প্রিয়মিলনের জন্য প্রতীক্ষা। রবীন্দ্রনাথের গানে বহু স্থানে এই ভাবটি লক্ষ করার মতো:

মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে।

কিন্তু 'অভিসার' একান্তই ভারতীয় অভিজ্ঞতাভিত্তিক শব্দ— প্রিয়মিলনের জন্য যাত্রা। 'ইনতিজারে' স্থিতি, 'অভিসারে' গতি। যেন একটায় 'বসে থাকা', অপরটায় 'চলাচল'। 'ইনতিজারে' একটা গভীর বিশ্বাস আছে, প্রিয়তম আসবেন। 'অভিসারে' একটা আশঙ্কা আছে। যদি প্রিয়তম না আসেন, তাই তাঁর কাছে যাওয়া।

এখন আমরা আলোচনা করব রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের গানে গানে সুফি কাব্য, বিশেষ করে হাফেজের কাব্য, কীভাবে ছায়া বিস্তার করেছিল। কোনো কোনো কবিতায় জালালুদ্দিন রুমির কাব্যের ছায়াও লক্ষ করা যায় (রুমি সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন উচ্ছ্বসিত)[৭]। এই পর্বের কবিতাগুলির পাতায় পাতায় কান পাতলে সুফিদের প্রেমিক ঈশ্বরের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের দুই গুণ (Attribute): transcendent ও immanent— যথাক্রমে দূরাভিসারী এবং মর্তমুখী। transcendent ঈশ্বর অবাঙ্মনসগোচর— বাক্য ও চিন্তার অতীত। তিনি সুদূর— তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক সম্ভব নয়— বুদ্ধি দিয়ে, মন দিয়ে তাঁর অপার, দুর্বোধ্য রহস্যকে উপলব্ধি করতে হয়— পারা যায় কি না কে বলবে? সমগ্র পৃথিবী আকাশ পর্বত মেঘমালা আর তারায় তারায় যে-মহিমা যে-বৈভব

জালালুদ্দিন রুমি।

পরিব্যপ্ত, বুদ্ধি দিয়ে তার রহস্যের গভীরে ডুব দিয়ে সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু immanent ঈশ্বর প্রেমাস্পদ— তিনি মানুষের কল্পনায়, মানুষের সান্নিধ্যে, তার প্রেমে, তার হাসিতে, অশ্রুতে সব সময় তার কাছে থাকেন। হাসি নিয়ে, আলো নিয়ে তিনি মানুষেরই প্রেমে নেমে আসেন (তুলনীয়: 'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর তুমি তাই এসেছ নীচে')। সমগ্র বিশ্ব তাঁরই প্রেমের, তাঁরই হাসির প্রতিবিম্ব (তুলনীয়:'আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা')। হাফেজের একটি বিখ্যাত গজলে ('অগর আঁ তুরকে শিরাজি ব-দস্ত্ আরাদ দিল-ই-মা-রা') প্রিয়ার গায়ের কালো তিল, যার বিনিময়ে প্রেমিক সমরখন্দ ও বোখারা বিলিয়ে দিতে পারেন, তা ঈশ্বরের জামাল (সৌন্দর্য) এবং জালাল (মহিমা)-রূপের প্রতীক। এই ঈশ্বরই 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের সকল কবিতায়, সকল গানে বিরাজমান। তাই 'গীতাঞ্জলি'র ঈশ্বর প্রধানত immanent ঈশ্বর, তিনি জ্ঞানময় নন, অনুভূতিময়। এই ঈশ্বরকে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত পেয়েছেন পিতার কাছে, পিতার হাফেজ-অনুরাগের মধ্যে।

'গীতাঞ্জলি'-পর্বে ফারসি সুফি কাব্য কীভাবে ক্রিয়াশীল ছিল দেখা যেতে পারে। প্রথম কথা 'আত্মবিলোপ' বা আমিত্বের বিসর্জন (ইকবাল যাকে বলেছেন 'বেখুদি', দ্রষ্টব্য: 'রমুজে বেখুদি'— আত্মবিলোপের রহস্য), যা সুফি কবিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম কবিতাতেই এই অহং বিসর্জনের জন্য আকুতি:

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে

অবশ্য এর আগে 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের 'কৃপণ' কবিতায় এই ভাবের পদধ্বনি শুনতে পাই। শেষ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সুফি কবির অহং বিসর্জনের জন্য তীব্র আর্তনাদ: 'তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে!' এই ব্যাকুল আত্মবিলোপের আকাঙ্ক্ষা জালালুদ্দিন রুমির একটি কবিতায় তীব্র আবেগে প্রতিফলিত হয়েছে। দুই বন্ধুর একজন ঘরের মধ্যে রয়েছেন, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরের বন্ধু দরজায় আঘাত করে ঘরের বন্ধুকে ডাকলেন। ভেতর থেকে প্রশ্ন এল, 'কে?' বাইরের বন্ধু বললেন, 'আমি।' দরজা খুলল না। বাইরের বন্ধু বিফল বাসনায় ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার এসে দরজায় আঘাত করলেন। আবার প্রশ্ন, 'কে?' এবার বাইরের বন্ধু বললেন, 'তুমি।' অমনি দরজা খুলে গেল। দুই বন্ধুর মিলন হল। স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্ববিখ্যাত কবিতার পরম অনুরাগী ছিলেন।[৮] এই কবিতায় বাইরের বন্ধুর দর্শন-আকাঙ্ক্ষা আরও ব্যাকুল এবং আরও নাট্যরসসমৃদ্ধ করার জন্য তিন বার প্রশ্নের কথা বলেছেন। এই কবিতা তাঁর সমগ্র জীবনের মনন ও প্রেমভাবনাকে উন্মথিত করেছিল।[৯] তিনি এই কবিতার ভাবানুবাদ করে দেখালেন, কীভাবে এই কবিতায় প্রেম, প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ একাকার হয়ে গেছে। বাইরের বন্ধু যতক্ষণ আমিত্ব-সচেতন ছিলেন, ততক্ষণ ভেতরের বন্ধুর দরজা খোলেনি। তারপর যেই তিনি বললেন, বন্ধু, আর 'আমার' বলে কিছু নেই, সব তুমিময় হয়ে গেছে, তখনই দুই বন্ধু, অর্থাৎ ভক্ত এবং ভগবান— প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ মিলিত হতে পারলেন। যখন তিনি বলতে পারলেন, 'আমার সকল শূন্য করে', আমার আমিত্বকে বিলীন করে তোমার কাছে সঁপে দিয়েছি, তখনই তো তাঁর সকল চাওয়া পরম প্রাপ্তিতে পূর্ণতা লাভ করল।

'আমি' এবং 'তুমি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা নিয়ে অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী তাঁর 'গীতাঞ্জলি অস্তিত্ব বিরহ' গ্রন্থে 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেছেন: ' ... 'আমি'-কে নত ক'রে 'তুমি'-র প্রতিষ্ঠাই 'আমি'-র প্রকৃত অভ্যুদয় এবং 'আমি'-র মধ্যে 'তুমি'-র প্রতিষ্ঠাই কবির অন্বিষ্ট। ... আমি যতক্ষণ আমিত্ব-দ্বারা স্পৃষ্ট ততক্ষণ সে বন্দী,'আমি' যখন মুক্ত, তখন আর 'আমি' নয়, তখন সে 'তুমি'... 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে আমরা দেখি 'আমি' সর্বদাই 'তুমি'-র দিকে ধাবিত। 'তুমি'-উন্মুখতা 'আমি'-কে তীব্র ক'রে রাখে।'[১০]

এখানে ড. চক্রবর্তী 'তুমি' 'আমি'র সম্পর্ক বড়ো সুন্দর করে বলেছেন। তাঁর বক্তব্য: এই 'আমি'র মধ্যে 'তুমি'কে প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যাকুলতাকে কবি 'প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কাব্যের, বিশেষত বৈষ্ণব কবিতার বিরহের মেটাফরে সাজিয়েছেন'।[১১] এসব ঠিকই, কিন্তু সুফি কবিরাও যে এ-বিষয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন, সে-কথা তিনি উল্লেখমাত্র করেননি। অথচ সঠিকভাবেই তিনি উপলব্ধি করেছেন: 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই দেখি 'আমি' এবং 'তুমি' একত্র হয়েছে, এবং 'আমি' 'তুমি'র কাছে নত হতে চাইছে (আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে)। এই 'আমি'র নত হওয়া এবং বিলীন হওয়াই তো সুফি কাব্যের অন্যতম প্রধান সুর। আবার 'গীতাঞ্জলি'র শেষ কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গেও লেখক বলছেন, ' 'তুমি' সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করুক 'আমি'-কে, 'তুমি'-র মধ্যে 'আমি' লুপ্ত হোক, বিরহ ও মিলন একাকার হয়ে যাক।'[১২] এসবই লেখক বলছেন, কিন্তু সুফি কাব্যের সঙ্গে একবার যদি মিলিয়ে দেখতেন, তাহলে বড়ো ভালো হত! 'তুমি'র মধ্যে 'আমি' লুপ্ত হোক, এটাই তো রুমির কবিতার অন্তিম বিচার। এই বিচারে পৌঁছোতে ড. চক্রবর্তী তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, কিন্তু সুফি কাব্যের উপস্থিতির

> **সুফি-ভাবনা তো 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে' ছিল, কিন্তু আমরা অনেকেই তা 'দেখতে পাইনি'।**

সম্ভাবনা যদি এখানে যোগ্য মান্যতা পেত (যেমন বৈষ্ণব কাব্য সম্পর্কে তাঁর ইঙ্গিত দিয়েছেন), তাহলে 'গীতাঞ্জলি'-পর্বে রবীন্দ্র-ভাবনার আর-একটি উৎস সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করতে পারতাম। সুফি-ভাবনা তো 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে' ছিল, কিন্তু আমরা অনেকেই তা 'দেখতে পাইনি'।[১৩]

এই 'তুমি' 'আমি'র সম্পর্ক নিয়ে আর-একজন ভারতীয় কবি বড়ো সুন্দর করে বলেছেন। তিনি আমির খুসরু (১২৫৩—১৩২৫)। হজরত মহম্মদ (স.) সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা (নাত)-র এক জায়গায় তিনি বলছেন:

মন তু শুদম তু মন শুদি
মন তন শুদম তু জাঁ শুদি
তা নাগোয়াদ কসি পাস আজ ইঁ
মন দিগরম, তু দিগরি।

প্রায় আশি বছর আগে আরবি-ফারসি সাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত আব্দুল গনী-ইল আব্বাসি বাংলা ভাষায় সমগ্র কবিতার একটি সরল কাব্যানুবাদ করেছিলেন। উল্লিখিত অংশের অনুবাদটুকু এইরকম: 'আমি হই তুমি, তুমি হও আমি, আমি তনু তুমি প্রাণ অন্তঃস্থিত যেন এর পরে কেহ নাহি কয়, তুমি ভিন্ন, আমি ভিন্ন রূপ ধরি।'[১৪] সম্প্রতি প্রকাশিত আমির খুসরুর কিছু নির্বাচিত রচনার ইংরেজি অনুবাদ সংকলন 'In the Bazar of Love'-এ এই অনুবাদ ও তার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ দেখা যেতে পারে।[১৫] আমির খুসরু হজরত মহম্মদ (স.) সম্পর্কে এ-কথাগুলি বলেছেন বটে, কিন্তু পৃথকভাবে এটিকে সুফি কাব্যের 'তুমি'-'আমি' সম্পর্কিত ভাবনার এক গভীর রূপক বলা যেতে পারে। আর 'তুমি'-'আমি'র এই প্রেম এবং মিলন বিরহ সমগ্র 'গীতাঞ্জলি'-পর্বকে এক গভীর ব্যঞ্জনায় ঐশ্বর্যময় করেছে।

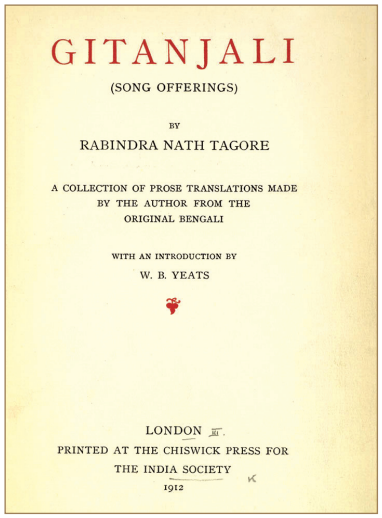
GITANJALI
(SONG OFFERINGS)
BY
RABINDRA NATH TAGORE
A COLLECTION OF PROSE TRANSLATIONS MADE BY THE AUTHOR FROM THE ORIGINAL BENGALI
WITH AN INTRODUCTION BY
W. B. YEATS
LONDON
PRINTED AT THE CHISWICK PRESS FOR THE INDIA SOCIETY
1912

এই আমিত্বের বিলোপ শেষ পর্যন্ত পরম প্রেমিকের কাছে। তখন সে আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে 'মজযুব' (majzub) অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে আত্মলীন হয়ে যায়। একেই সুফিরা বলেন 'ফানা'— 'ফানা ফিল্লাহ্'— আল্লাহ্‌র মধ্যে লীন হওয়া। বৌদ্ধদের নির্বাণতত্ত্বের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু সুফিরা আর-এক ধাপ এগিয়ে বলেন, এই সত্তার শেষ নেই, আরও একটি স্তর আছে 'বাকা'— 'বাকা বিল্লাহ্'— আল্লাহ্‌র কাছে আবার বেঁচে ওঠা। সুফিদের এই ভাবটির সঙ্গে জার্মান কবি গ্যেটের শেষ বয়সের রচনা 'West-Eastern Divan'– 'প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিওয়ান' কাব্যগ্রন্থের 'Selig sehnsucht'-এর এই অংশের সাদৃশ্য আছে: 'Die that thou mayst be reborn'।[১৬] আত্মনিবেদনের সঙ্গে-সঙ্গে এই ভাবটিও 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের অনেক কবিতায় ফুটে উঠেছে। একটি বিখ্যাত গানের দুটি চরণ উদ্ধৃত করা যায়:

তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।

ক্ষণে ক্ষণে হারানোতে ভয় নেই, কারণ, আশা আছে তাঁকে নতুন করে পাওয়া যাবে। হারানোর মধ্যে যদি 'ফানা'র ভাবনাকে স্পর্শ করা যায়, তবে নতুন করে পাওয়ার (অর্থাৎ হারানোর পরের রূপ) মধ্যে 'বাকা'র ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর-একটি গানের কথা বলা যায়— 'আমায় যে সব দিতে হবে'। তার শেষ চরণদুটি এইরকম:

আমার বলে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার করে দেব, তখন তারা আমার হবে।

যখন আমি নিঃশেষে ঈশ্বরের কাছে সব দিয়ে দেব, অর্থাৎ আমার আর-কিছুই থাকবে না, তখন তারা নতুনভাবে, নতুন রূপে আমার কাছে, আমার জন্য জেগে উঠবে। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর বিখ্যাত 'Tintern Abbey' কবিতায় বলছেন:

... we are laid asleep
In body and become a living soul.

গ্যেটের 'die that thou mayst be reborn'— এই শব্দবন্ধেও একই কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। আবার রবীন্দ্রনাথের যে-কথাগুলি আমরা আলোচনা করছিলাম, সেখানেও একই সুর।

প্রেমাস্পদের কাছে প্রেমিকের এই আত্মনিবেদন হল একটা পন্থা, যার মধ্যে দিয়ে তাঁরা একসঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু এ ছাড়াও 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের অনেক কবিতায় প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের নিত্য আসা-যাওয়া আমরা লক্ষ করি। সেখানে প্রেমাস্পদ, মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এ-বিষয়ে অনেক কবিতার মধ্যে দু-চারটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি:

কূজনহীন কাননভূমি
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে
একেলা কোন্ পথিক তুমি
পথিকহীন পথের 'পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম
রয়েছে খোলা এ-ঘর মম
সমুখ দিয়ে স্বপনসম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে।
[গীতাঞ্জলি, গান ১৮]

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে,
তোমার চন্দ্র-সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।
[গীতাঞ্জলি, গান ৩৪]

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে,
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।
[গীতাঞ্জলি, গান ১২১]

প্রেমাস্পদের এই আগমন সকল সময় স্পষ্ট দিবালোকে সম্ভব হয় না। কখনও কখনও অন্ধকার রজনীর নীরবতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে 'হৃদয়হরণ'

'গীতাঞ্জলি'-পর্বের অনেক কবিতায় প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের নিত্য আসা-যাওয়া আমরা লক্ষ করি। সেখানে প্রেমাস্পদ, মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

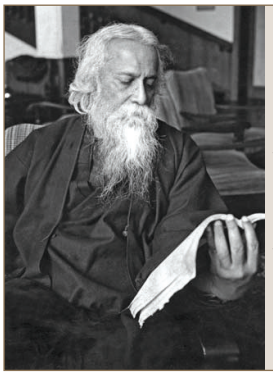

‘গীতাঞ্জলি’-পর্বের কবিতা ও গানগুলিতে ফারসি সুফি কাব্য এমনভাবে মিশে গেছে, মনে হয়, এর আত্মীকরণ বড়ো নিপুণ শিল্পকর্মে উন্নীত হয়েছে।

প্রেমিকের আবির্ভাব হয়। তিনি গোপন চরণ ফেলে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে আসেন। অন্ধকার রজনী সুফি কবিদের মাহেন্দ্রক্ষণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হাফেজের গজলের এই চরণদুটি উচ্চারণ করতে ভালোবাসতেন:

গো শামা মা-ইয়ারেদ দর ইঁ জমা, কে ইমশব
দর মজলিসে মা মাহে রুখে দোস্‌ত্‌ তামাম আস্ত্‌।

দেবেন্দ্রনাথের নিজের অনুবাদ দেখা যাক:

আমার এ-সভাতে দীপ আনিও না। আজিকার রাত্রিতে
সেই পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু এখানে বিরাজমান।

মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের ঠিক এমনি একটা চরণ:

আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপখানি

আবার,

শ্রাবণঘন গহন মোহে
নীরব তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে

এবং,

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।

অন্ধকার রজনীর মতো নীরবতা ও নিস্তব্ধতাও সুফি কবিদের প্রিয়। এই নীরবতার মধ্য দিয়েই ‘হৃদয়হরণ’-প্রেমিকের আবির্ভাব হয়। এই নিস্তব্ধতাকে সুফিরা বলেন প্রেমিকের প্রাসাদের প্রবেশদ্বার, এই পথ দিয়েই তাঁকে ওই প্রাসাদে পৌঁছোতে হয়, ‘গীতাঞ্জলি’র ক্রমিক সংখ্যা: ১৯, ৩১, ৩৩, ৪৭, ৫৯, ৬০, ১২১, ১৫৭। তিনি শুধু আসেন (তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি?/ওই যে আসে আসে আসে), কিন্তু পরিপূর্ণ মিলন হয় না। এ হল unrequitted love— অতৃপ্ত কামনা, ফারসি গজল সাহিত্যে যা একেবারে ধ্যানের ধন। তাঁর জন্য প্রেমিককে অহরহ ইনতিজার থাকতে হয় অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে:

আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে

মধ্যযুগের একজন কবি আলি রাজা ভারি সুন্দর বলেছেন: ‘দিবানিশি ইনতিজার, দিবানিশি বেকারার।’ পথ দীর্ঘ এবং অনন্ত, তার শেষে কোনোদিন পৌঁছোনো যায় না, পথের শেষে তাঁকে পাওয়া গেলে সব শেষ। তাই সুফি কাব্যে প্রিয়তমের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলন নেই, কিন্তু অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আছে। শেলি তাঁর শেষজীবনের একটি অসামান্য কবিতায় সীমাবদ্ধ মানুষের অতৃপ্তির দহনকে একেবারে অমর করে রেখেছেন: The desire of the moth for the star। (রবীন্দ্রনাথ এর বাংলা অনুবাদ করেছেন এইভাবে: তারার লাগি পতঙ্গ যে আশায় মরে ঘুরে)। তারকার কাছে পতঙ্গ কোনোদিন পৌঁছোতে পারবে না জেনেও তার আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু নেই, কবে সে পৌঁছোবে, এর জন্য অনন্ত প্রতীক্ষা (ইনতিজার), অনন্ত বেদনা। এই বিশ্বব্যাপী বিরহবোধের সামিল হয়ে পতঙ্গ ও নক্ষত্র অমর হয়ে রইল। এই বিরহ ও দুঃখ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রায়শই অনুভব করতেন। এই বিরহ ‘গীতাঞ্জলি’-পর্বের কবিতাগুলির পরম গৌরব। তুলনীয়— ‘গীতাঞ্জলি’: ১৬, ২৪, ২৫, ৮৬, ৯০, ৯১, ৯২ (তালিকা চূড়ান্ত নয়)।

এই unrequitted love, এই বিরহ শুধুই বেদনা দেয়, তা নয়, কখনও কখনও বেদনাকে সুন্দর করে তোলে। ‘গীতাঞ্জলি’র বিরহের চরিত্র এইরকম: প্রেমিক হৃদয় দিয়েছে, কিন্তু উদাসীনতা পায়নি, প্রতিদানে সে পেয়েছে আঘাত। উদাসীনতা নির্মম, সে হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কিন্তু আঘাত নির্মম নয়। এই আঘাতই তো সুখ, সুফি কবিরা একেই বলেন ‘দর্দ’। এই ‘দর্দ’ বেদনা নয়, বেদনা আর সুখের মসৃণ মিশ্রণ। এই ভাবটি ‘দর্দ’ ছাড়া আর কোনো বাংলা বা ইংরেজি শব্দে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আমরা এই ভাবটি লক্ষ করি:

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।

[গান, পৃ. ৫৯৫]

এটাই তো কাজি নজরুল ইসলামের ভাষায় ‘ব্যথার দান’ অর্থাৎ বিরহের দান। এইভাবেই বিরহ মঞ্জুর হয় (তুলনীয়: ‘বিরহ মধুর হ’ল আজি মধুরাতে’। গান, পৃ. ৩৩২)। এই ‘দর্দ’ই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে, সে-ই বিরহকে নাস্তি থেকে রক্ষা করে। এই ‘দর্দ’ই প্রেমিকের মেহমান, মহার্ঘ অতিথি।

Unrequitted love বা অতৃপ্ত প্রেম থেকে জাত যে-বেদনা, সেটি কাজি নজরুল ইসলামের গানে প্রখরতর। এর কিছু কারণ অনুধাবন করা যায়। প্রেমে রবীন্দ্রনাথকে অতৃপ্তির সম্মুখীন হতে হয়নি বলেই মনে হয়। তাই তাঁর বিরহের গানেও একটি গভীর প্রশান্তি আছে, জ্বালা নেই, যে-জ্বালায় নজরুলের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। আরও একটি কথা। রবীন্দ্রনাথের সুফিভাবাপন্ন প্রেমের গানে যে সন্তাপ নেই জ্বালা নেই তার আর-একটি কারণ হল, এখানে গালিবের গজলের মতো ‘রকিব’ অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকের (ইকবাল যাকে বলেছেন ‘হরজাই’) অনুপস্থিতি। তাই রবীন্দ্রনাথকে কখনওই নজরুলের মতো বলতে হয়নি:

আর সহে না দিল নিয়ে এই
দিলদরদীর দিল্লগী।

রবীন্দ্রনাথের গানে প্রেমিক যখন ইনতিজার তার প্রিয়তমের জন্য, তখনও একটা পরম আশ্বাস, পরম নির্ভর তাঁর বিরহ-সন্তপ্ত অন্তরকে সিক্ত করে রেখেছিল। ‘সে’ আসবে বলে এত গভীর তাঁর প্রত্যয় যে, অবিশ্বাসীদের প্রতি মৃদু আক্রমণ ছুড়ে দিয়ে তিনি জানাতে চাইলেন, তোরা কি শুনতে পাসনি, তিনি আসছেনই? এটারও অন্যতম কারণ, মনে হয়, পিতার হাত ধরে তাঁর হৃদয়ে হাফেজের প্রবেশ।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি। ফারসি কাব্য এবং রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে চিত্ত-বিনিময়ের এই মহার্ঘ অবসরে আমাদের ভাবনা কখনওই পশ্চিমি তাত্ত্বিক গ্রামশির হেজিমনি

‘সে’ আসবে বলে এত গভীর তাঁর প্রত্যয় যে, অবিশ্বাসীদের প্রতি মৃদু আক্রমণ ছুড়ে দিয়ে তিনি জানাতে চাইলেন, তোরা কি শুনতে পাসনি, তিনি আসছেনই? এটারও অন্যতম কারণ, মনে হয়, পিতার হাত ধরে তাঁর হৃদয়ে হাফেজের প্রবেশ।

(আধিপত্য)-তত্ত্ব অথবা এডওয়ার্ড সাইদের কালচারাল ইম্পিরিয়ালিজম (সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ)-তত্ত্বের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। রবীন্দ্রনাথের পারস্য-বন্দনা (ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ইরানিয়াজম' গ্রন্থ শেষ করেছেন এই বাক্য দিয়ে: ইরানমানিশ জিন্দাবাদ— ইরানবাদের জয় হোক) বা পারস্যের কাব্যপ্রেমিকদের রবীন্দ্র-অনুরাগ সাম্রাজ্যবাদী ঘোষণার প্রতীক হয়ে ওঠে না। রাজনীতি বা অর্থনীতির ভুবন-জোড়া আস্ফালনের সদম্ভ উপস্থিতির বাইরে প্রাণের নিভৃতে এই সাংস্কৃতিক বিনিময় ক্রিয়াশীল ছিল। তাই একটি গভীর মিশ্রণের ভাবনায় আমরা আপ্লুত হই। 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের কবিতা ও গানগুলিতে ফারসি সুফি কাব্য এমনভাবে মিশে গেছে, মনে হয়, এর আত্মীকরণ বড়ো নিপুণ শিল্পকর্মে উন্নীত হয়েছে। দুটিকে সহজে পৃথক করা যায় না। অপরপক্ষে কাজি নজরুল ইসলামের অনেক গজলে বা গ্যেটের অসামান্য গীতিকবিতার সংকলন 'West-Eastern Divan'— 'প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিওয়ানে' (হাফেজের দিওয়ান, অর্থাৎ গজলের সমষ্টির জার্মান অনুবাদ পাঠ করে গ্যেটে একেবারে মুগ্ধ হন, এবং হাফেজের পরম অনুরাগী হিসেবে তাঁরই অনুপ্রেরণায় নিজে এই কাব্যগ্রন্থ লেখেন) ফারসি প্রসঙ্গকে সহজেই ধরা যায়। গ্যেটে তো তাঁর ওই কাব্যগ্রন্থে একাধিক বার হাফেজের এবং অনান্য সুফি কবিদের কথা বলেছেন। তাঁদের ভাবচ্ছবি ব্যবহার করেছেন। আর নজরুলের গজলকে তো বাংলা ভাষায় ফারসি গজল বলা যায়। এ-বিষয়ে রবীন্দ্র-কবিতায় প্রবেশ অনায়াস নয়। কিন্তু যদি পরিশ্রম করে প্রবেশ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, ফারসি গজলের শীতল সমীরে হৃদয় মন জুড়িয়ে যাচ্ছে। গ্যেটের 'প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিওয়ান' পাঠ করে কবি ইকবাল এর জবাবে লিখেছিলেন: 'পায়াম-ই মাশরেক'— প্রাচ্যের বার্তা। সেই গ্রন্থের 'গ্যেটে ও জালাল' শীর্ষক একটি কবিতায় তিনি কল্পনা করেছেন, স্বর্গে গ্যেটে ও জালালুদ্দিন রুমি একসঙ্গে পরস্পরের চিত্ত-বিনিময় উপভোগ করছেন।[১৭] রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের কবিতাগুলি পাঠ করে মনে হয়, এখানেও ইকবালের কল্পনায় গ্যেটে-জালালের অনুরূপ হাফেজ-রবীন্দ্রনাথের মিলন অপরূপ মূর্তি লাভ করেছে। ১৯৩২ সালে পারস্য ভ্রমণ কালে হাফেজের সমাধি দর্শন শেষে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবেগ যেভাবে উচ্ছ্বসিত হয়েছে, সেইটা উদ্ধৃত করে এ-প্রসঙ্গ শেষ করব: 'নিশ্চিত মনে হ'ল আজ, কত শত বৎসর পরে জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে-মানুষ হাফেজের চেনা লোক।'[১৮]

কবির কল্পনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলি, 'গীতাঞ্জলি'র পাতায় পাতায় হাফেজ-রবীন্দ্রনাথের মিলিত নিঃশ্বাসবায়ু নতুন করে 'সৌরভেতে মন্থর' হয়ে ওঠে। বাংলা কাব্যের সে এক পরমক্ষণ!

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ', নতুন সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭১। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও হাফেজ' প্রবন্ধটি 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থের সংযোজন, পৃ. ৫৭৮—৫৯৩।

২. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, 'আত্মজীবনী', কলকাতা, ১৩৮৮, হাফেজ-উদ্ধৃতির পৃষ্ঠাসমূহ: ৭২, ১১৬-১১৭, ১১৮, ১১৯, ১৪৪, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৬৪।

২ক. Notopoulos J., 'The Platonism in Shelley', New York, 1969, P. 96।

৩. অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ', পৃ. ৩৬।

৪. 'প্রবাসী', ১৩৩৩, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৯, উদ্ধৃত, ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'দিওয়ান-ই-হাফেজ', ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৮, ভূমিকা, আগেকার আনা হিসেবে তিন আনা অর্থাৎ এখানে ৩ পৃষ্ঠা।

৫. 'জাপানে-পারস্যে', পৃ. ৪৬৪।

৬. Maulana Ziauddin, 'Sadbond-i-Tagore', Baptist Mission Press, Calcutta, 1935।

৭. বিবেকানন্দ রুমির কবিতা সম্পর্কে বিশ্বাস করতেন: এখানে প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ একাকার হয়ে যায়।

৮. রুমির 'তুমি' ও 'আমি'র বিষয়ে এই কবিতা সম্পর্কে বিবেকানন্দ ছিলেন আবেগবিহ্বল। 'ধর্মতরঙ্গ বইছে' কবিতায় তিনি রুমির এই ভাবটি ব্যবহার করেছিলেন। তার কিছু চরণ এইরকম:

তিনি আমার প্রেমাস্পদ,
প্রেমাস্পদ সম্পর্কে অভেদবোধই সর্বোচ্চ ভাব।

৯. ড. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের শেষ খণ্ডের প্রস্তাবনা অংশে বিবেকানন্দের কেন্দ্রীয় ভাবনার প্রবণতা বোঝাতে রুমির এই কবিতাটিকে আবার স্মরণ করেছেন, সপ্তম খণ্ড, ১৯৮৮, প্রস্তাবনা, পৃ. ১২।

১০. জগন্নাথ চক্রবর্তী, 'গীতাঞ্জলি অস্তিত্ব বিরহ', আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ. ১৫।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

১৩. 'তুমি'-'আমি'র সম্পর্কের মতো আর-একটি বিষয়েও এ-কথা বলা যায়: 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের বিরহ প্রসঙ্গ। তিনি বলেছেন, 'এমন গভীর বিরহ 'গীতাঞ্জলি' ছাড়া অন্য কোনো কাব্যে এমন ক'রে ঘনায়নি।' কিন্তু তিনি যদি সুফি কাব্যের আলোকে 'গীতাঞ্জলি'র বিরহকে বিচার করতেন, তাহলে তিনি এই মন্তব্য করতেন না বলে মনে হয়।

১৪. সংস্কৃতি-সমন্বয়সাধক রেজাউল করীমের মধ্যম ভ্রাতা আব্দুল গনী-ইশ আব্বাসি আরবি-ফারসিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। কিছু কিছু আরবি-ফারসি কবিতার বাংলা অনুবাদ পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে। দেখুন, আবুল হাসনাত, 'বুদ্ধির মুক্তি ও রেজাউল করীম' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ, 'রেজাউল করীম: পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি', বহরমপুর, ২০০৬, পৃ. ২০।

১৫. 'In the Bazar of Love', the selected poetry of Amir Khusrau, translated and introduced by Paul E. Losensky and Sunil Sharma, Penguin books, India, 2011, Introduction, p. xxx।

১৬. Goethe, 'The West-Eastern Divan', stuttgard, 1819। English Translation, J. Whalley, London, 1974, কবিতাটির নাম: 'Selig Sehnsuch' (Blessed Longing), Whallay's translation of the line: 'Die and have new birth', p. 27।

১৭. Allama Iqbal, 'Payam-i-Mashriq' (Message of the East), Selected English translation by R A Nicholson in a bi-lingual (German and English) journal, 'Islamica', ed. A Fischer, Vol. I, 1924, p. 114।

১৮. 'জাপানে-পারস্যে', পৃ. ৪৫৯।

সুফিদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তিনি কাদম্বিনী দেবীকে এক পত্রে লিখেছেন: 'তুমি মনে কোরো না, প্রতিমাপূজা ছাড়া প্রেম হতেই পারে না,— যদি সুফিদের প্রেমের সাধনার বিবরণ পড়ে থাক, তবে দেখবে, তাঁরা কী আশ্চর্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কী অপরিসীম প্রেমের মিলন সাধন করিয়েছেন। তাঁদের সেই প্রেম কেবল একটা শূন্য ভাবের জিনিস নয়, তা অত্যন্ত নিকট, অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, অথচ তার সঙ্গে কোনো প্রকার কাল্পনিক জঞ্জালের আবর্জনা নেই।' [দ্রষ্টব্য: কয়েকখানি পত্র, ২০ আষাঢ় ১৩১৭, 'প্রবাসী', পৌষ ১৩৩৪, পৃ. ৩৯৪-৪৫, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯০১—১৯১৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৩০৫।] ■

গত তিরিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। পড়াশোনায় সাফল্যের পর তাঁরা দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় সফট্ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার

আবুল ফজল

বাড়ির চেয়ে বেশি পেয়েছি মিশন থেকে

আসাদুল ইসলাম

'আল-আমীন বার্তা'র জন্য 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' বিভাগের পঞ্চদশতম লেখা এবারেরটি। 'আল-আমীন বার্তা' পাঁচ বছর পূর্ণ করল ২০১৫ ডিসেম্বর। প্রথম থেকেই 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' বিভাগটি আছে। এবং সব ক-টি সংখ্যাতেই আল-আমীন মিশনের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিটি জীবনই আলাদা— তাঁদের লড়াইও, তাঁদের সাফল্যও। প্রতিটি মানুষের জীবনই অন্তত একটি সার্থক উপন্যাস— এরকম শুনেছিলাম। কিন্তু 'আল-আমীন বার্তা'য় আমরা যেটুকু জীবন-আলেখ্য তুলে ধরি (মিশন ছাত্র-ছাত্রীদের) তাকে বড়োজোর ছোটোগল্প বলা যেতে পারে। 'আল-আমীন বার্তা'য় গল্পের কোনো বিভাগ নেই, সেদিক থেকে ছোটোগল্প বিভাগেরও পরিপূরক হিসেবে 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' বিভাগটিকে ভাবাই যায়। বিভাগটা একঘেয়েমি হয়ে যাচ্ছে না তো? এই প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগতেই এতগুলো কথা উত্তর হয়ে উঠল। ঠিক তখনই ডাইরির একটি পাতায় চোখ আটকে গেল, যে-ডাইরিটা হাতে ধরে নিয়ে বসেছিলাম, প্রস্তুত হচ্ছিলাম এই লেখাটি লেখার জন্য। যে-ডাইরির পাতায় পাতায় তুলে রেখেছি আল-আমীন মিশনের উজ্জ্বল প্রাক্তনীদের সুখ-দুঃখের, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির টুকরো টুকরো রঙিন মুহূর্ত। দেখলাম, ওই ডাইরির পাতার এক কোণে ইংরেজিতে একটি কথা লেখা আছে, অনেক ডাইরিতে উৎসাহ-ব্যঞ্জক বা নীতিকথার মতো নানান লেখা থাকে না, সেরকম। কথাটার বাংলা অর্থ এরকম— সাফল্য হল ছোটো ছোটো উদ্যোগের সমষ্টি, যে-উদ্যোগগুলো দিনের পর দিন বার বার নিয়ে যেতে হয়। কথাটা কতই সুন্দর! তা-ই না? এরপর কোনো প্রশ্ন না রেখে এবারের উজ্জ্বল প্রাক্তনীর জীবনকথায় প্রবেশ করাই যায়।

এই সংখ্যায় যাকে নিয়ে লিখছি, তাঁকে আমি চিনি না। নামও শুনিনি। প্রথম পরিচয় হল কথা বলতে বসে। তিনি সফট্ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। বর্তমানে থাকেন কলকাতার নিউ আলিপুরের মতো অভিজাত এলাকায়। কাজ করেন কলকাতার সবচেয়ে পরিচিত অফিসপাড়া সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে। কোম্পানির নাম টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস। এখানে পৌঁছোনোর জন্য যাত্রা শুরু করেছিলেন প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে। গ্রামটা মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানায়। নাম লক্ষ্মীনারায়ণপুর। যে-নামটা শুনে মনে হচ্ছে, সনাতন ধর্মের লোকজনই এই গ্রামের বাসিন্দা? ধারণাটা ভুল। প্রায় একশো শতাংশই মুসলমানের বাস এই গ্রামে। মুসলমানপ্রধান গ্রাম যেমন হয়, তার সব বৈশিষ্ট্য বহন করছে লক্ষ্মীনারায়ণপুর। গ্রামের বেশির ভাগ মানুষের জীবিকা চাষবাস। পুঁজি দৈহিক শ্রম। এখন আবার গ্রামের ছেলেরা চাষবাসের দিকে না ঝুঁকে দিনমজুরের কাজ করতে চলে যাচ্ছে ভিন রাজ্যে, এমনকী মধ্যপ্রাচ্যেও। এগারো বছর আগে এই গ্রাম থেকে ইঞ্জিনিয়ার বের হলেও, আজও এই গ্রামের প্রধান সমস্যা অশিক্ষা। যেমন আমাদের আলোচ্য ইঞ্জিনিয়ারের বাবা মহম্মদ আবদুল জব্বার সেখ, মা আইমা বিবি প্রথাগত কোনো শিক্ষাই নিতে পারেননি। পাঁচ পুত্র ও এক কন্যাসন্তান নিয়ে তাঁদের আট জনের বৃহৎ সংসারের চালিকা শক্তি ছিল চাষের আয়। ভরসা ছিল

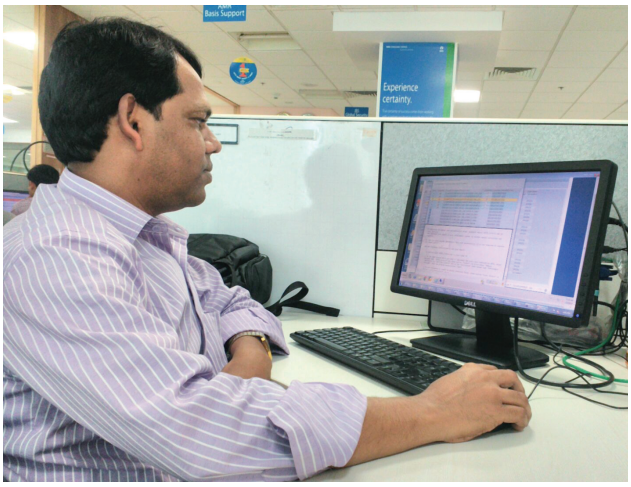

একটাই— নিজস্ব জমিটুকু। জব্বার সাহেবের ছিল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করার অসম্ভব প্রাণশক্তি। নিজের সন্তানদের সহযোগী হিসেবে পেলে কোনো সমস্যাই থাকবে না সংসারে, স্বপ্নের এমন জাল বুনতেন তিনি। সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল খানিকটা। জ্যেষ্ঠ পুত্র আসরাফ সেখ স্নাতক হন এবং পোস্ট অফিসে একটি চাকরিও পান। কিন্তু পৃথিবীতে কত জনের স্বপ্ন আর সব দিক থেকে সার্থক হয়। অন্য সন্তানেরা সেভাবে আর পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। সেভাবে মানে চাকরিবাকরি পাওয়ার মতো। একমাত্র সবার চেয়ে ছোটোটি ছাড়া। নতুন আলোক বৃত্তে পৌঁছে কনিষ্ঠ সন্তান জব্বার সেখের সমস্ত অপূর্ণ আশাকে পূর্ণতা দিয়েছেন। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে পিতার সমস্ত না-পাওয়ার দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছেন। কীভাবে সম্ভব হল? খুব কী সহজ ছিল এই পথ-পরিক্রমা? মোটেও না। দেখাই যাচ্ছে এটা একটা অসম যুদ্ধ জেতার গল্প। কোনো অসম যুদ্ধে সহজে জেতা যায় না।

মহম্মদ আবদুল জব্বার সেখের ছোটোছেলে আবুল ফজলের ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল কোনো লক্ষ্য স্থির না করেই। ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার বা করানোর কোনো স্বপ্নই ছিল না তাঁদের কল্পনার চৌহদ্দির মধ্যে। স্বপ্নে ছিল একটু স্বচ্ছলতা ও লক্ষ্যহীন পড়াশোনা শেখানো। ঠিক যেমন থাকে একটা অতি সাধারণ পরিবারে। আবুল ফজলদের গ্রামেই প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুলও। তাই গ্রামে পড়াশোনার চল কম, মানে পড়াশোনা যে কেউ করে না, এমন নয়। প্রায় প্রত্যেকেই নিম্ন-মাধ্যমিক বা মাধ্যমিকের দড়ি ছোঁয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষার আলো, যে-আলো আলোকিত করবে গ্রামকে, তা পৌঁছোয় না গ্রামে। লক্ষ্মীনারায়ণপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম হাটপাড়া, পূর্ব উদয়চাঁদপুর, নিশ্চিন্দপুর, দুর্গাপুর— সর্বত্র একই ছবি। কোথাও কোথাও লক্ষ্মীনারায়ণপুরের থেকেও অবস্থা খারাপ। আবুল ফজলের পরিবার ছিল পুরোপুরি কৃষিনির্ভর। যাঁরা গ্রামের মানুষ, তাঁরা অনেকেই জানেন, এমন পরিবারের ছোটো সদস্যও ছাড় পায় না। বড়োদের মতো হাল চাষ, বীজ বপন, ফসল তোলা, ঝাড়াই-মাড়াইয়ের মতো কাজ না করতে পারলেও, চা-জলখাবার নিয়ে যাওয়া, গোরুগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে আসা, এমন বহু কাজ করতে হয় ছোটোদের। আবুল ফজলও এসবের বাইরে ছিলেন না। বাবা-দাদাদের সানন্দে সহযোগিতা করা আর স্কুল যাওয়া, এই ছিল তাঁর নিত্য দিনের কাজ। তাঁদের মাটির তিন কামরা বাড়িতে যে বিদ্যুৎ নেই, থাকার জায়গার অভাব, সেসব নিয়ে তেমন ভাবনাই ছিল না তাঁর। তবে ধাক্কা একটা এল, বলা যায় তাঁর জীবনের প্রথম ধাক্কা, যেটা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে— যৌথ সংসার ভাঙার ধাক্কা। সব পরিবারই ভাঙে। কিন্তু ভাঙনের সময়টা ভালো ছিল না। তখন আবুল ফজল ক্লাস নাইনে পড়েন, উদয়চাঁদপুর উচ্চ-বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রই বলা যায়। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত দ্বিতীয় হতেন, নবম ও দশম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলেন। আবুল ফজল ছোটো হওয়ায় একটা সুবিধা হয়েছিল, দাদাদের পুরোনো বই নিয়েই তাঁর চলে যেত। টিউশনিও ছিল না তাঁর। স্নাতক বড়োভাই আসরাফ সেখ ছিলেন তাঁর ভরসা, মূল প্রেরণা। তিনিই পড়াতেন তাঁকে, ক্লাস টেনে গিয়ে অবশ্য ইংরেজি আর বিজ্ঞান বিভাগটার জন্য টিউশনি নিয়েছিলেন। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় সংসারের ভিত খানিক আলগা হলে আবুল ফজলের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। তখন তা ঠেকাতে উদ্যোগ নেন আসরাফ সাহেবই। আবুল ফজল মাধ্যমিক দিয়েছিলেন ১৯৯৬ সালে। পেয়েছিলেন ৭৪.৫ শতাংশ নম্বর। আসরাফ সাহেব পার্শ্ববর্তী হাটপাড়া গ্রামে একজনের কাছে খবর পেয়ে জেনেছিলেন আল-আমীন মিশন নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে অনেক ভালো পড়াশোনা হয়, আর গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের ফ্রিতেও পড়া যায়, তাঁর ছেলে আপেল হক পড়েছেন সেখানে, এই আপেল হককে আবুল ফজলও তাঁদের স্কুলের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেখেছিলেন। ওই স্কুলের ছাত্র না হয়েও এলাকার নাম উজ্জ্বল করা মেধাবী পড়ুয়া হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। আপেল হকের মুখ থেকে আল-আমীন মিশনের কথা জেনেছিলেন আবুল ফজল। পরীক্ষার রেজাল্ট হাতে নিয়ে আসরাফ সাহেবের সঙ্গে আল-আমীন মিশনের সেই সময়কার একমাত্র ক্যাম্পাস খলতপুরে পা রেখেছিলেন। মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি এম নুরুল ইসলামের সঙ্গে আবুল ফজলের দাদা কথা বললেন। পরিবার ভেঙে যাওয়ায় জমিজমা সব ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সবটা শুনে সেক্রেটারি স্যার আবুল ফজলকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দেন। শুরু হয় আবুল ফজলের জীবনের নতুন অধ্যায়। মিশনে এসে কেমন লেগেছিল? প্রশ্ন শুনে আজকের ইঞ্জিনিয়ার আবুল ফজল হালকা হাসেন। সেই হাসির অর্থ ব্যাখ্যা করতে দেন কথার জোগান, 'মিশন তখন আজকের মতো ছিল না ঠিকই, এত ব্যাপ্তি এবং উন্নত পরিকাঠামো ছিল না। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছিল, যা পাচ্ছি, সেটুকুই বাড়তি পাওনা। বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না, সঙ্গে পড়াশোনার পরিবেশ ও জায়গার অভাব ছিল। বাড়িতে আমরা যা খেতাম, মিশনে তার চেয়ে ভালো খাবার দিত।'

ওঁর কথাকে কেটে দিতে যখন বলি, তবুও তো কেউ কেউ অসন্তুষ্টির কথা বলে। তখন সঙ্গে-সঙ্গে যোগ করেন, 'দু-চার জনের অসন্তুষ্টি থাকলেও আমাদের মতো যারা মিশনে ঠাঁই পায়, মিশনে আসার আগের জীবন তাদের যতটা দিয়েছিল, তার চেয়ে বেশি পায় মিশনে এসে। হ্যাঁ, আজও আমার এ-কথা মনে হয়।' মিশনে এসে আবুল ফজলের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি ঘটল এইসব সুযোগসুবিধা পাওয়া নয়, পড়াশোনার একটা দিক নির্দেশ পাওয়া। পড়াশোনা কেউ এমনি এমনি করে না, প্রতিটি কাজের মতোই তার একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্য ধরেই এগোতে হয়। স্বপ্নহীন ছাত্র-ছাত্রীরা মিশনের পরিবেশে এসে চারপাশে বহু নতুন বিষয় দেখতে শুরু করে। শুনতে পায় মিশনের পুরোনো ছাত্র-ছাত্রীদের শীর্ষ-ছোঁয়া সাফল্যের কথা। স্বপ্ন দেখার সাহস জোগান সেক্রেটারি স্যার, সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষকরাও। নানা পেশার গুণী মানুষজনদের নিয়ত মিশনে এসে বক্তব্য রাখতে দেখে পড়ুয়ারা নিজেরাও স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। আল-আমীন

মনে হয়েছিল, যা পাচ্ছি, সেটুকুই বাড়তি পাওনা। বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না, সঙ্গে পড়াশোনার পরিবেশ ও জায়গার অভাব ছিল। বাড়িতে আমরা যা খেতাম, মিশনে তার চেয়ে ভালো খাবার দিত।

মিশন এভাবেই স্বপ্নহীন মানুষদের স্বপ্ন দেখার সাহস জুগিয়ে চলেছে তিন দশক ধরে। আবুল ফজলেরও বুকের মধ্যে সাহস জমা হতে থাকে, চোখের সামনে একটা স্বপ্ন ঘোরাফেরা করতে শুরু করে।

তাঁর চোখের সামনে তখন মিশনের উজ্জ্বল প্রাক্তনী, তাঁদের গ্রামের পাশের গ্রাম হাটপাড়ার তুফান আলির উদাহরণ। তুফান যদি পারে তাহলে আবুল ফজল পারবে না কেন? এই প্রশ্ন রাখেন নিজের কাছে। সফল হতে হবে। শুরু হয় প্রস্তুতি। প্রথম লক্ষ্য উচ্চ-মাধ্যমিকটা ভালোভাবে দেওয়া। ১৯৯৮ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে আবুল ফজল পেয়েছিলেন ৭২.২ শতাংশ নম্বর। আল-আমীন মিশনের তখন যে-ব্যবস্থাপনা ছিল, তখন সব মিলে ওই বছর উচ্চ-মাধ্যমিক দিয়েছিল মাত্র আঠারো-কুড়ি জন ছাত্র। স্টার মার্কস পেয়েছিল মাত্র একজন, মসিউর রহমান (বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ার)। এই ব্যবস্থাপনার বহর দেখে বোঝা যাচ্ছে, সেই সময় আবুল ফজলদের মতো ছাত্ররা যেমন আর্থিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে এগোতে চাইছে, ঠিক তেমনি আল-আমীন মিশনও। সেই সময়কার আল-আমীন মিশন আর তার পড়ুয়াদের লড়াইয়ের কথা আবুল ফজলের জীবন থেকে ধার নিয়ে আরও একটু বলা যাক। তখন সবে মিশন পড়ুয়াদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে। মিশন জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থাপনাই গড়ে তুলতে পারেনি। এই যেমন আবুল ফজলরা উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করার পর জয়েন্টের কোচিং নিতে যেতেন কলকাতায়, আর থাকতেন খলতপুরে। কলকাতায়, তাও মিশনের নিজস্ব কোচিং সেন্টার নয়। তখন কোচিং হত কলেজ স্ট্রিটের গাইডেন্স গিল্ডে। ছাত্ররা খলতপুর থেকে খেয়েদেয়ে এসে ক্লাস করতেন কলেজ স্ট্রিটে। প্রতি শনি ও রবিবার ক্লাস হত। শনিবার রাতটা আবুল ফজলরা থাকতেন আল-আমীন মিশনের তৎকালীন কলকাতার ঠিকানা পার্কসার্কাসের জাননগর রোডের ঘরে। সেখানে সবার একসঙ্গে ঘুমানোর জায়গা হত না বলে পালা করে ঘুমাতেন, সে-কথা তো আগেই এই বিভাগের অন্য লেখায় জানিয়েছিলাম পাঠকদের। আবুল ফজলদের থাকার ব্যবস্থার মতো খাওয়ারও কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারেনি আল-আমীন মিশন। ছাত্রদের জন্য খলতপুর থেকে যাতায়াতের ভাড়া আর কলকাতার সস্তার হোটেলে খাওয়ার জন্য নগদ পয়সা হিসেব করে দিয়ে দিতেন মিশন কর্তৃপক্ষ। সে-হিসেব ছিল— ভাতের জন্য দশ টাকা আর টিফিনের জন্য পাঁচ টাকা, ছাত্র-পিছু। এভাবে এক বছর কোচিং নেওয়ার পর ১৯৯৯ সালে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় আবুল ফজল তেমন ভালো কোনো র‍্যাঙ্ক করতে পারেননি। অনেক পিছনে র‍্যাঙ্ক ছিল। শিবপুরে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ ছিল কিন্তু হননি। সামনের বছরও যে র‍্যাঙ্ক হবে, তার কোনো নিশ্চয়তাও কেউ দিতে পারেন না। কী করবেন দোটানায় পড়ে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে হাওড়ার আমতা কলেজে ভর্তি হলেন। ওদিকে মনও মানে না। দু-তিন জন সহপাঠী জয়েন্টে সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। আমিও পড়ব— এরকম একটা জেদ তৈরি হচ্ছিল মনের মধ্যে। সেক্রেটারি স্যারের সঙ্গে দেখা করে শেষ সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ করায়, তিনি অনুমতি দিলেন। বলা বাহুল্য, আবুল ফজলের জয়েন্ট কোচিংয়ের দু-বছরের যাবতীয় খরচও বহন করেছিল মিশন। 'আল-আমীন বার্তা'র পাঠকরা জানেন, পড়েছেন হয়তো বার্তাতেই, একজন পড়ুয়া বার বার ব্যর্থ হলেও, তাঁর ইচ্ছাশক্তি থাকলে মিশন তাঁর উপর ভরসা রাখে।

এভাবে শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সুযোগ পেয়েছে বহু ছাত্র-ছাত্রী। আবুল ফজলও এরকম একজন। পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে আবুল ফজলের র‍্যাঙ্ক হল ২৬৭৭। ভর্তি হলেন হলদিয়া ইনসটিটিউট অব টেকনোলজিতে। প্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। রি-কাউন্সিলিং হলে তিন মাস পর আইটি-তে চলে আসেন। সুযোগ তো পেলেন কিন্তু ভর্তি হবেন কীভাবে? বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ তো অনেক। তাঁর সেই দুশ্চিন্তা দূর করতেও পাশে পেলেন আল-আলীন মিশনকে। ভর্তির অর্ধেক টাকা আর প্রথম সেমিস্টারের পুরোটাই তুলে দিয়েছিল মিশন। তারপর আইডিবি-র স্কলারশিপ পেলে খানিকটা দুশ্চিন্তামুক্ত হন। ২০০৪ সালে বি-টেক পাস করেন। ওই বছরেই নভেম্বর মাসে চাকরি পান সিএমসি-র ক্যামাক স্ট্রিট ব্রাঞ্চে। চাকরির প্রথম দিনটার কথা আবুল ফজল স্মরণ করেন আজও: 'চাকরিতে যোগ দিয়ে এক বেলা কাজ করার পর, বিকেলে টিফিন করতে এসে বাড়িতে ফোন করেছিলাম। তখন বাড়িতে কোনো ফোন ছিল না। পাশের বাড়িতে ফোন করে মাকে ডেকে কথা বলেছিলাম। চাকরি পাওয়ার কথা পুরোটা মাকে জানাতে পারিনি। গলা ধরে এসেছিল কান্নায়। ফোন রেখে চোখের কোণে পানি মুছে প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম আনন্দে কীভাবে মানুষের চোখে জল আসে।' প্রথম মাসের বেতন নিয়ে মা-আব্বাসহ বাড়ির অনান্যদের জন্য কেনাকাটা করেছিলেন। দ্বিতীয় মাসের বেতন সেক্রেটারি স্যারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এইসব টুকরো ঘটনা কী শিক্ষা দেয়, কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা সকলেই জানি। আবুল ফজল যে-শিক্ষা অর্জন করেছেন, তারই প্রতিফলন এসব ঘটনা। পেশাগত জীবনে সফল হওয়া মানুষের জীবনে একটা বড়ো বিষয় ঠিকই, কিন্তু মূল্যবোধহীন মানুষ হলে সমগ্র শিক্ষা অর্জনের যোগফল দাঁড়ায় শূন্য। আবুল ফজল সেটা হতে দেননি। যে অর্জিত শিক্ষার জোরে তিনি আজ সম্মানজনক পেশায় আছেন, ভালো উপার্জন করেন, শিক্ষিতা চাকুরিজীবীকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বাছতে পেরেছেন এবং বস্তুগত সম্পদ অর্জন করতে পেরেছেন, সেই শিক্ষাই তাঁকে শিখিয়েছে যৌথভাবে বাঁচতে, শিকড়কে নিজের সংস্কৃতিকে না ভুলতে, যতটা পারা যায় অপরের পাশে দাঁড়াতে। কলকাতায় থাকলেও মাসে এক-দু বার তাঁকে বাড়িতে যেতেই হয়। তাঁর উপার্জনে তৈরি করা দ্বিতল বাড়িতে তাঁর মা পথ চেয়ে দিন কাটান। মা-বাবা কলকাতায় এসে থাকতে চান না, তাই তাঁকেই যেতে হয় সমস্ত ব্যস্ততা সরিয়ে রেখেই। আল-আমীন মিশনকেও তিনি ভোলেননি। প্রতিবছর অল্প হলেও কিছু অর্থ মিশনকে দেন, তাঁরই মতো অন্য কোনো আবুল ফজলের মতো মুখটাকে মনে রেখে। কথা বলার শেষলগ্নে এ-প্রসঙ্গে বলা আবুল ফজলের একটা কথা মুহূর্তে বাক্যহীন করে দেয়: 'আল-আমীন মিশন আমার মতো, অবদান রেখেছে যেসব ছেলেমেয়েদের জীবনে, তাদের মিশনকে মনে রাখতে হবে, বাবা-মাকে মনে রাখার মতো। পৃথিবীর যেখানেই যাই বাবা-মাকে যেমন আমরা ভুলতে পারি না, সেভাবেই মনে রাখতে হবে।' যখন এ-কথা শুনি তখন চুপ করে শুধু ভাবারই অবকাশ থাকে। অনুভূতির কোন স্তরে পৌঁছোলে কোনো পড়ুয়া এমন কথা বলতে পারেন, সেভাবনাই ঘুরপাক খায় শুধু। রত্নগর্ভা মায়ের যেমন সন্তানগর্বে ভরে থাকে বুক, তেমন আল-আমীন মিশনের বুকও তো ভরিয়ে রেখেছেন আবুল ফজলেরা। এঁরাই মিশনের রত্ন। মিশনরত্ন। ■

জলজ প্রাণীদের জগৎ বিচিত্র ও রহস্যময়। নানান স্বভাবের গুণে তারা চিরকালের আকর্ষণের বিষয়। তাদের নিয়ে নিরন্তর মানুষের কৌতূহল। তাদের সম্পর্কে যেন জানবার শেষ নেই সীমা নেই। কেউ কেউ মানুষের নিকট-বন্ধু, কেউ-বা দূরত্বে থেকে যায়। এই পাতায় তাদের কথা।

বন্ধু ডলফিন

এন জুলফিকার

জানুয়ারি মাস। বেজায় ঠান্ডা পড়েছে ক-দিন। বারান্দার রোদে শতরঞ্জি পেতে এক কাপ চা আর খবরের কাগজ নিয়ে বসেছি সবে। এমন সময় বর্ষা এসে বলল, 'বলো তো, কোন জলজ প্রাণীর বাচ্চাকে কাফ বলে?'

— কাফ? তার উৎসাহে ভাটা যাতে না পড়ে, সেজন্য আমি এমন ভান করলাম, যেন এর উত্তর আমার জানা নেই।

— হ্যাঁ, কাফ। আর স্ত্রী-প্রাণীটিকে বলে কাউ, পুরুষটিকে বলে বুল?

আমি অনেকক্ষণ মাথা চুলকে বললাম, 'জানি না তো!'

একগাল হেসে বর্ষা বলল, 'এ মা, তুমি এটা জান না? ডলফিন। জান তো, ডলফিন আমার খুব প্রিয়।'

আমি বললাম, 'কেন?'

— কারণ, ডলফিন নদী বা সমুদ্রে মানুষ ও অন্য ডুবন্ত প্রাণীর সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। কেউ ডুবে যাচ্ছে দেখলেই ডলফিন তাদের পিঠে করে তীরের কাছে বয়ে আনে, আর তারা বেঁচে যায়।

— আর?

— ওরা আমাদের খেলা দেখায়। জল থেকে লাফিয়ে উঠে শূন্যে অনেক বার পাক খেয়ে জলে পড়ে। আমি টিভিতে দেখেছি, ট্রেনিং দেওয়া ডলফিন বড়ো জলাশয়ে রিংয়ের মধ্য দিয়ে লাফ দেয়, ওয়াটার স্কির দড়ি মুখে করে টেনে নিয়ে যায়, ছোটো ডিঙি-নৌকো গা দিয়ে ঠেলে কোনো শিশুকে পাড়ে পৌঁছে দিয়ে তার আদর খায়, আবার সাঁতারের নানা কসরতও দেখায়।

— বাঃ, তুই তো দেখি ডলফিন সম্পর্কে অনেক কিছু জানিস।

— অনেক আর কই? ওইটুকুই তো জানি।

— তুই ডলফিন সম্পর্কে আরও জানতে চাস?

— হ্যাঁ, অনেক কিছু।

'তবে চল, ডলফিন সম্পর্কে আরও কিছু জেনে নেওয়া যাক।' বর্ষা আর আমি শীতের রোদে গোল হয়ে বসলাম। শুরু হল আমাদের ডলফিন-চর্চা।

আমরা যেমন বাংলায় 'শুশুক' বলি; তেমনি নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, হাঙ্গেরি, গ্রিস, জার্মানি, পোল্যান্ড, রোমানিয়া প্রভৃতি দেশে তাকে বলে 'ডেলফিন'; টার্কিরা বলে 'ইউনুস'; সোমালিরা বলে 'হুমবোরো'; মালয়িজ বলে 'লুম্বা লুম্বা'; ভিয়েতনামিরা বলে 'কা হিয়ো'; আরবরা বলে 'নয়িফালাদ'— এমনি নানা ভাষায় কত তার নাম।

জানিস তো, ডলফিন নামের উৎস গ্রিক শব্দ 'ডেলফিস', যা 'ডেলফাস' থেকে এসেছে। 'ডেলফাস' মানে 'জঠর'। অর্থাৎ সেই মাছ, যার জঠর আছে। প্রাচীনকালে, প্রায় দু-হাজার বছরেরও বেশি আগে গ্রিসের মানুষ বাঁশির সুর আর সংগীতের প্রতি ডলফিনের আকর্ষণ টের পেয়েছিলেন। ডলফিন তাদের কাছে এক পবিত্র মাছ। অতীতে কেউ ডলফিন মেরে ফেললে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। কেননা, কথিত আছে, গ্রিক সূর্যদেবতা অ্যাপোলো একবার ডলফিন-রূপ ধারণ করেছিলেন।

সারা বিশ্বে প্রায় চল্লিশ প্রজাতির ডলফিন দেখতে পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বটলনোজ ডলফিন। প্রজাতি ভেদে ডলফিনের দৈর্ঘ্য চার ফুট থেকে তিরিশ ফুট, আর ওজন চল্লিশ কেজি থেকে দশ টন পর্যন্ত হয়। এরা মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী। মা-ডলফিন একবারে একটি শিশু-ডলফিনের জন্ম দেয়। সে প্রায় দেড় থেকে দু-বছর তার মায়ের সঙ্গে-সঙ্গে ঘোরে। বটলনোজ ডলফিন প্রায় দশ থেকে চোদ্দো ফুট লম্বা, গড় ওজন প্রায় পাঁচশো কেজি। এরা জল থেকে লাফ দিয়ে শূন্যে প্রায় ষোলো ফুট উঁচুতে উঠতে পারে। অন্য প্রজাতির ডলফিন লাফ দিয়ে কেউ কেউ তিরিশ ফুট উঁচুতেও পৌঁছে যায়। এরা জলের প্রায় এক হাজার

ফুট গভীরে ডুব দিতে পারে। সাধারণত ক্রান্তীয় ও অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলের নদী বা সমুদ্রে ডলফিন বেশি দেখা যায়। এরা ঘণ্টায় প্রায় পঁচিশ মাইল সাঁতার কাটতে পারে। বাঁচে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর, তবে কোনো কোনো ডলফিন প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরও বাঁচে। ডলফিন সাধারণত লোনা জলে বাস করে, তবে কিছু ডলফিন মিঠে জলের বাসিন্দা। ডলফিনের মাথার ওপরে একটা ছিদ্র আছে, যা দিয়ে তারা শ্বাস নেয়। এদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণক্ষমতা অসাধারণ, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি দুর্বল। তবে মৎস্যবিজ্ঞানীদের মতে, এরা নাকি মানুষের মতো মিষ্টি, তেতো, টক, নুন— এইসব স্বাদ ঠিক বুঝতে পারে। ডলফিনের মুখে কমবেশি একশোটি ধারালো দাঁত আছে, কিন্তু এরা চিবিয়ে খেতে পারে না। কারণ, এদের চোয়ালে মাংসপেশি নেই। তাই এরা শিকার ধরেই তাকে গিলে ফেলে। গোরুর মতো এদেরও দুটো পাকস্থলী আছে। প্রথমটাতে খাদ্য জমা হয়, আর অন্যটি দিয়ে এরা খাবার হজম করে। একটি পূর্ণবয়স্ক ডলফিন সারাদিনে প্রায় তেরো-চোদ্দো কেজি মাছ খায়।

সবচেয়ে বড়ো প্রজাতির ডলফিন হল 'কিলার হোয়েল', যার অপর নাম 'ওরকা', তা আসলে এক ধরনের ডলফিন। এদের বিজ্ঞানসম্মত নাম 'ডেলফিনিডি'। এরা প্রায় তিরিশ ফুট লম্বা হয়।

ডলফিন দল বেঁধে ঘোরে। এক-একটি দলে দশ থেকে বারোটা ডলফিন থাকে। সমুদ্রে তার একমাত্র শত্রু হল হাঙর। তবে কখনও কখনও ডলফিনরা হাঙরকে ঘিরে ধরে বারংবার তাদের ঠোঁটের আঘাতে তাকে মেরে ফেলে। ডলফিনের চামড়া খুব নমনীয়, ফলে কোনো কিছুর ঘর্ষণে বা আঘাতে তা সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এদের শরীরে এমন কিছু আছে, যার মাধ্যমে দ্রুত এদের ক্ষত শুকিয়ে যায়। এরা যখন ঘুমোয় তখন যাতে ডুবে না যায়, সেজন্য এদের অর্ধেক মস্তিষ্ক ঘুমোয়, আর বাকি অর্ধেক শ্বাস নেওয়ার জন্য জেগে থাকে।

জানিস তো, আমাদের দেশ ভারত বা পার্শ্ববর্তী নেপাল ও বাংলাদেশের পরিষ্কার জলের নদীতে যে-ডলফিন দেখা যায়, তাকে বলে 'গ্যাঙ্গেস রিভার ডলফিন'। এদের বিজ্ঞানভিত্তিক নাম Platanistidae Gangetica। গঙ্গার বিপন্ন ডলফিনকে বাঁচানোর জন্য ভারত তাকে 'জাতীয় জলজ প্রাণী' হিসেবে ঘোষণা করেছে। আর একে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য গঙ্গা নদীতে তৈরি হয়েছে 'বিক্রমশীলা গ্যাঙ্গেটিক ডলফিন স্যাংচুয়ারি'।

আমি বর্ষাকে বললাম, 'আচ্ছা, তুই কি ডলফিন আর সেই বোকা বানরের গল্পটা জানিস?' বর্ষা খুব করুণভাবে দু-দিকে মাথা দোলাল।

শোন তাহলে। অনেক দিন আগে একদল নাবিক বেশ কয়েক মাসের জন্য সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। নাবিকের সঙ্গে ছিল পোষা বানর। কিছুদিন পর যখন তারা মাঝ-সমুদ্রে, তখন ভয়ংকর এক ঝড় উঠল। প্রবল হাওয়ার দাপটে ওলটপালট হতে হতে হঠাৎ জাহাজের পাল ছিঁড়ল, মাস্তুলও ভেঙে গেল। সেই দুর্যোগে জাহাজটা যেন একটা ছোট্ট ডিঙির মতো। প্রবল ঢেউয়ের ধাক্কায় একসময় তা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। ফলে সবাই সমুদ্রে পড়ে গেল। বানরটা কিছুক্ষণ জলে ভেসে থাকার পর যখন ডুবে যাচ্ছে, এমন সময় ডলফিন তাকে পিঠের ওপর নিয়ে নিল। বানরটা ডলফিনের পিঠ আঁকড়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর তারা একটা দ্বীপে এসে পৌঁছোল। তীরের কাছে আসতেই সে ডলফিনের পিঠ থেকে নেমে এল। ডলফিন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি এই জায়গাটা চেন?' বানরটা চালাকি করে উত্তর দিল, 'নিশ্চয়। আমার যে সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, সে এই দ্বীপের রাজা। তুমি তো আসলে জান না, আমি হলাম এক রাজকুমার।'

ডলফিন কিন্তু জানত, এই দ্বীপে কোনো প্রাণী থাকে না। সে বানরের চালাকি বুঝতে পেরে বলল, 'ওহ্, তাই নাকি? তুমি তো তাহলে এবার রাজা হবে।' বানর বুঝতে না পেরে বলল, 'কী করে আমি রাজা হব?' ডুবসাঁতার দিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে চলে যেতে যেতে ডলফিন উত্তর দিল, 'খুব সোজা। কারণ, ওই দ্বীপে তুমি ছাড়া আর তো কোনো প্রাণী নেই।'

বর্ষা এতক্ষণ তন্ময় হয়ে গল্পটা শুনছিল। আমি গল্প থামাতেই বলল, 'আব্বু, যারা মিথ্যা বলে আর নিজেকে নিয়ে বড়াই করে, তারা শেষে সে-কারণেই বিপদে পড়ে, তা-ই না?' আমি বললাম, 'এই তো, একদম ঠিক বলেছিস তুই।'

বললাম, 'এই গল্পে খেয়াল করেছিস, ডলফিন কথা বলছিল?' বর্ষা বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু ওটা তো গল্প, তা-ই।' আমি বললাম, 'জানিস তো, ডলফিনরা নাকি নিজেদের মধ্যে কথাও বলে!'

— তা-ই বুঝি!

— হ্যাঁ, ওরা নাকি হুইসল দেয়, টক-টক করে, আবার কখনও কোঁ-কোঁ বা চিঁচিঁ আওয়াজ করে। ক্যালিফোর্নিয়ার ডলফিনগবেষক সারা ওয়ালার বহুদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, বটলনোজ ডলফিনদের কেউ একজন আওয়াজ করলেই, অন্য একজন প্রায় তৎক্ষণাৎ এভাবেই উত্তর দেয়। বিজ্ঞানী ডেনিস হারজিং, যিনি বাহামাতে দীর্ঘদিন ধরে ডলফিন নিয়ে গবেষণা করেছেন, এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি প্রায়ই বুঝতে পারি, তারা নিজেদের মধ্যে বলছে, "এখানে বেশ ভালো মাছ আছে", কিংবা "সবাই খেয়াল রেখো, হাঙরটা এখন শিকারে বেরিয়েছে"।' ■

অনেক বাধা পেরিয়ে তিনি যেমন জগৎসভায় আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিলেন, সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রামে তেমনই এগিয়ে এসেছিল 'বুলবুল' পত্রিকা। তাঁর অগ্রজ মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহার চৌধুরীর সঙ্গে তিনি ছিলেন 'বুলবুলে'র যুগ্ম সম্পাদকও। তাঁর রচিত এই নিবন্ধটিতে রয়েছে মননের পরিচয়। তিনি শামসুন নাহার

শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা

শিশুপালন সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই সকলের আগে দুটো বিষয় আলোচনা করতে হয়,— শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা আর চরিত্র গঠন। স্বাস্থ্য এবং চরিত্র দুটোই মানুষের জীবনে খুব দরকারী জিনিষ, আবার দুটোই এমন ওতপ্রোত ভাবে সম্পর্কিত যে, দুটোকে মোটেই আলাদা ক'রে দেখা যায় না। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, শিশুর আহার। সকল শিক্ষিতা জননীই আজকাল জানেন যে, শিশুকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ভাবে খেতে দিতে হবে। নিরূপিত সময়ের বাইরে শিশু কাঁদলেও তার আহারের জন্য মাতা ব্যস্ত হবেন না, কারণ তাতে তার পরিপাকের বিষম অসুবিধা হবার আশঙ্কা। এই তো গেল শারীরিক ক্ষতির কথা, তারপরে আরও একটা কথা আছে, যেটা স্বাস্থ্যের চেয়ে কিছু কম দরকারী নয়। সেটা হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা (moral education)। শিশু কাঁদলেই যদি খাবার পায়, তা হলে কান্নাকে সে স্বার্থসিদ্ধির একটা অব্যর্থ অস্ত্র বলে জেনে নেবে। শুধু শৈশব জীবন ব'লে নয়, পরবর্ত্তী কালেও যখন তখন অন্যায় আবদার ক'রে, অভিযোগ ক'রে কাজ আদায়ের চেষ্টা করবে। কাজেই শুধু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নয়— অকারণ অতৃপ্তি ও অসন্তোষ যেন শিশুর মজ্জাগত না হ'য়ে যায়, এই জন্যও শিশুকে কান্নার সঙ্গে সঙ্গেই খেতে দিতে নেই— আধুনিক বিজ্ঞান এই বলছে। কাজেই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের শিশুশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া চাই স্বাস্থ্য এবং চরিত্র দুটোই। শিশুর দেহ সবল, স্বাস্থ্যবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রও দৃঢ়, বলিষ্ঠ হোক— এই আমাদের সাধনা হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধেও এই বিষয়ই আমরা আলোচনা করব।

ঠিক জন্মের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত থেকেই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত, একথা আগে মানুষের ধারণাতেই আসত না। যুগে যুগে সকল পিতামাতাই নবজাত শিশুকে শুধু রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে এবং ভালবেসেই তৃপ্তি পেয়েছেন। অন্ততঃ কথা বলতে শিখবার আগে যে শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবহিত হওয়া দরকার, একথা কেউ ভাবেন নি। এখনো পর্য্যন্ত অনেকে ভাবতে পারেন না, ঠিক জন্মের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে এক বৎসর বয়স

জন্মের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত থেকেই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত, একথা আগে মানুষের ধারণাতেই আসত না।

পর্য্যন্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং পিতামাতার হাবভাব আচার-ব্যবহার থেকে শিশু সকলের অজ্ঞাতে তিলে তিলে যে শিক্ষা আহরণ করে, ভবিষ্যৎ জীবনে তার মূল্য কত বেশী। কিন্তু বিজ্ঞানের চোখে এই সূক্ষ্ম সত্য ধরা পড়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে: শুধু জন্মের পর থেকেই নয়, মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেও সন্তানের দেহমনের সুস্থতা এবং চরিত্রগঠনের জন্যে জননীকে অনেকখানি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মায়ের এই সময়কার প্রত্যেকটী কাজ ও প্রত্যেকটী চিন্তার প্রভাব সন্তানের উপর তিলে তিলে সঞ্চারিত হয়।

শিশু যখন প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তার অভ্যাস ব'লে একটা জিনিষ মোটেই থাকে না। যা থাকে সেটুকু তার স্বভাবজাত বুদ্ধি— ইংরাজীতে যাকে বলে Instinct। মাতৃগর্ভে আট, দশ মাস থেকে যে সব অভ্যাস তার তৈরী হয়েছিল, বাইরের জগতে সে সব একেবারেই অচল। কাজেই এই রূপ-রস-গন্ধ-ভরা পৃথিবীর আলো-বাতাসের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হবার পরে প্রত্যেকটী ব্যাপার তার কাছে একেবারে অদ্ভুত, বিসদৃশ ঠেকে। নতুন জীবনে, নতুন আবহাওয়ায় প্রত্যেকটী জিনিষ তাকে নতুন ক'রে শিখতে হয়। এমনকি, অনেক সময় দেখা গেছে, শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের প্রণালীও অনেক কষ্টে শেখে। একমাত্র মাতৃদুগ্ধ পান ছাড়া জাগ্রত অবস্থায় শিশু আর কিছুতেই আরাম পায় না। এই বিশ্রী অসোয়াস্তির ভাব থেকে বাঁচবার জন্যেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেশীর ভাগ সময় সে ঘুমিয়ে কাটায়। ক্রমে সপ্তা দুয়েকের মধ্যে এই অস্বস্তির ভাবটা কেটে আসে, এই নতুন জীবনযাত্রার সঙ্গে সে ক্রমেই পরিচিত হয়ে ওঠে। চৌদ্দ পনর দিনের অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ অভ্যাসে পরিণত হতে থাকে। এই সময় থেকে আরম্ভ ক'রে এক বছর পর্য্যন্ত শিশু কোন কিছুতে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয়ে যায়। শুধু যে দ্রুত অভ্যস্তই হয়, তা নয়; প্রথম বৎসরের অভ্যাস ও শিক্ষা শিশুর মনে একেবারে শিকড় গেড়ে বসে যায়। শিশু যে স্বভাবজাত বুদ্ধি বা Instinct নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে, ঠিক তারই মত এই সময়কার অভ্যাসগুলো একেবারে রক্তমাংসে মিশ্রিত হয়ে যায়। মানুষ চিরদিনই অভ্যাসের দাস। কিন্তু অতি শৈশবের অভ্যাসের মতো পরবর্ত্তী জীবনের অভ্যাসের মূল কখনো এত দৃঢ় হয় না। এই সময়ে যে অভ্যাস হয়, এরপরে তা বদলানো অনেক সময় অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। কাজেই এই সময়কার শিক্ষা যেন সুশিক্ষা হয় এবং এমন ভাবে যেন শিশু না গ'ড়ে ওঠে, যার জন্যে ভবিষ্যৎ জীবনে অসুবিধা ভোগ করতে হবে, এ বিষয়ে পিতামাতা বিশেষ সতর্ক হবেন। বাস্তবিকই ঠিক জন্মের মুহূর্ত্ত থেকেই শিশুর নৈতিক শিক্ষা আরম্ভ হওয়া খুবই দরকার। যে কাজ বড়োরা করলে একান্ত অশোভন ও আপত্তিজনক ঠেকে, শিশুরা যদি তা করে পিতামাতার স্নেহের চোখে তার দোষ নিশ্চয়ই অতটা ধরা পড়ে না। কিন্তু এটা মস্ত বড়ো ভুল। সন্তান শিশু হলেও সে একেবারে নির্ব্বোধ নয়। তার বুদ্ধি সীমাবদ্ধ। কিন্তু যেটুকু বোঝে তার মধ্যে আর কোন ফাঁকি থাকে না। মোটের ওপর তার বুদ্ধির সীমা যতদূর চলে, তার ভেতর সে বুড়োদের চেয়ে কোন অংশে কম চালাক নয়— তার সঙ্গে ব্যবহারে একথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে। অবশ্য বুড়োদের সঙ্গে এক বৎসরের শিশুর কার্য্য-কলাপের তুলনা করাই অন্যায়। কিন্তু তবুও বড় হলে সন্তানের পক্ষে যে কাজ আপত্তিজনক হবে, সে কাজে একান্ত শৈশবেও তাকে যতদূর সম্ভব প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো।

সাধারণতঃ শিশু যখন ছোট থাকে তখন তার নৈতিক শিক্ষার কথা আমরা একেবারেই ভুলে থাকি; শুধু আদর সোহাগ আর স্নেহ-মমতায় তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখবার চেষ্টা করি। তার পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একদিন আমরা এবিষয়ে সচেতন হ'য়ে উঠি এবং তার সঙ্গে আমাদের আচার ব্যবহারে সেদিন থেকে পুরোপরি কঠোর হয়ে উঠতে চেষ্টা করি। শিশুর জীবনে কিন্তু এটা একটা দারুণ হতাশার মুহূর্ত্ত। জন্মের পর থেকে শিশু কোন কাজেই বাধা পায় নি, সে একেবারে হঠাৎ বাধা-নিষেধের কড়াকড়ির মধ্যে পড়ে বিষম হাঁফিয়ে ওঠে; যে দুনিয়াটা এত দিন ছিল মাধুর্য্যে মধুর, করুণায় মেদুর, হঠাৎ তা হয়ে ওঠে একেবারে কঠোর, কর্কশ। এই নিদারুণ হতাশা থেকে শিশুকে বাঁচাতে হলে তার সঙ্গে আমাদের ব্যবহারে জন্মের মুহূর্ত্ত থেকে আরম্ভ ক'রে আগাগোড়াই মিল রেখে চলতে হবে, বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশের আগেও তার নৈতিক শিক্ষার দিকটাকে অবহেলা করলে কোন মতেই চলবে না।

সময়ানুবর্ত্তিতা শিশুর জীবনে খুবই দরকার। আহার, নিদ্রা, স্নান, পায়খানা, প্রস্রাব প্রত্যেকটী ব্যাপারে তাকে প্রথম থেকেই নিয়মানুবর্ত্তী ক'রে তোলা চাই। প্রতিদিন একই সময়ে শিশু যেন একই জিনিষ প্রত্যাশা করতে শেখে। স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা মঙ্গলজনক, আবার নৈতিক শিক্ষার দিক দিয়েও এতে অনেক লাভ হয়।

জন্মের পরে কিছুদিন শিশুকে স্থানান্তরিত না করাই ভালো। একই আবহাওয়া, একই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সে যেন অন্ততঃ প্রথম বৎসরটা কাটাতে পারে। মর্ত্তের মাটিতে নূতন জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হ'তে তার কিছুটা সময় লাগে, একথা বলেছি। এই সময়ে এক জায়গায় থাকতে পেলে এই পরিচয়টা স্বাভাবিক গতিতে ক্রমে নিবিড় হয়ে উঠবার সুযোগ পায়। কিন্তু স্থান হতে স্থানান্তরে যদি তাকে নিয়ে যাওয়া হয়— তাহলে অত পরিবর্ত্তনের তাল সামলানো তার পক্ষে সহজ হয় না, অত নতুন জিনিষের সঙ্গে পরিচয় করতে গিয়ে তার কোমল মস্তিষ্ক সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই বয়সে নূতনত্বের প্রতি শিশুর শুধুই যে বিতৃষ্ণা থাকে তা নয়, প্রত্যেকটা নূতন জিনিষকে সে ভয়মিশ্রিত সন্দেহের চোখে দেখে। অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত মানুষের মধ্যে সে কিছুতেই নিজেকে নিরাপদ মনে ভাবতে পারে না। একটা আশঙ্কার ভাব তার লেগেই থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই বুদ্ধির বিকাশ হয় ও পৃথিবীটাকে জানবার বুঝবার আগ্রহ বাড়তে থাকে ততই তার এই স্বাভাবিক ভীরুতা কমে আসে। ক্রমেই সে পারিপার্শ্বিক জগতের প্রত্যেকটী জিনিষের সঙ্গে শীগগির পরিচয় ক'রে নিতে ব্যাকুল হয়— আর তাই করতে গিয়ে অনেক সময় দুঃসাহসিকতারও পরিচয় দেয়। কিন্তু স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বলে জন্মের অব্যবহিত পরে অন্ততঃ এক বৎসরকাল দৈনন্দিন জীবনে কোন পরিবর্ত্তন না হলেই সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বস্থির নিশ্বাস ফেলে। এতে তার মনের স্বাভাবিক শান্তি, আনন্দ আর সন্তোষ অক্ষুণ্ণ থাকবার সুযোগ পায়।

শিশুকে প্রথম থেকেই আত্মনির্ভরশীল ক'রে তোলার চেষ্টা করা উচিত। সে যেন তার নিজের ইচ্ছামত মনের আনন্দে খেলা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে— এইজন্যে যথেষ্ট পরিমাণ সময় ও স্বাধীনতা দিতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় পরিজনবর্গের আদর সোহাগে শিশু এত বেশী ব্যতিব্যস্ত থাকে যে, তার নিজের কিছু করবার আছে একথা অনুভব করবারই অবসর পায় না। বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে কেউ না কেউ অনবরত শিশুকে কোলে নেওয়া, ঘুম পাড়ানো, গান শোনানো বা দোলা দেওয়া মোটেই ভাল নয়। শুধু যে এতে তার দেহের অবাধ রক্ত-সঞ্চালনেরই প্রতিবন্ধকতা হয় তা নয়, সে একেবারে অসহায়, নির্জীব, পরমুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে। সন্তান গঠনের সময় প্রত্যেকটী ব্যাপারে শিক্ষাদাতার দৃষ্টিকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত রাখতে হবে। এখানেও তিনি ভুলবেন না যে, শৈশবের শিক্ষা শুধু শৈশবেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শৈশবের অভ্যাস ভবিষ্যৎ জীবনেও সন্তানকে পরনির্ভরশীলই ক'রে রাখবে।

শিশুর সুখশান্তিবিধানের জন্য পিতামাতা কখনো উদাসীন হবেন না, বরং তার সকল অসুবিধা দূর ক'রে কেমন ক'রে তাকে আরাম দেওয়া যায় এই

চিন্তায় রাত্রের সুপ্তি ও দিনের বিরামকে নির্ব্বাসিত করবেন, এ অতি স্বাভাবিক। কিন্তু এইখানে ব'লে রাখা ভালো যে সন্তানের আরামের জন্য তাঁদের ব্যগ্রতা যেন কোন মতেই সীমা ছাড়িয়ে না যায়— অন্ততঃ শিশু যেন তা ঘুণাক্ষরেও টের পেতে না পারে। শিশুর প্রতি ঔদাসীন্য ও অতি-মনোযোগ, এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন হচ্ছে শিশুশিক্ষার ব্যাপারে একটা খুব বড় জিনিষ। শিশুর মঙ্গলের জন্য, শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতখানি দরকার পিতামাতা সবই করবেন; তবে সেই সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আদর বা সহানুভূতির ভাব কখনো প্রকাশ করবেন না। নবাগত ক্ষুদ্র শিশু অল্প দিনেই তাঁদের হৃদয়ের কতখানি অধিকার করেছে— তাঁদের স্নেহের চোখে তার স্থান কত উচ্চে, একথা যেন সে কখনো অনুভব করতে না পারে। কারণ তাতে সে নিজেকে খুব বড় মনে করবার সুযোগ পায়। Self importance-এর ভাবটা শিশুদের পক্ষে খুবই খারাপ।

দু তিন মাসের সময় শিশু হাসতে শেখে; সেই সঙ্গে বস্তু এবং ব্যক্তির পার্থক্যও বুঝতে আরম্ভ করে। এর আগে দুধের বোতলের (feeding bottle) জন্যে তার যতটা মমতাবোধ ও আকর্ষণ থাকে মায়ের জন্যে তার চেয়ে বেশী থাকে না। এই বয়সে মায়ের সঙ্গে তার নিজের সম্পর্ক সে প্রথম নিবিড় ভাবে অনুভব করে। মাতাকে দেখে অস্ফুটস্বরে আনন্দপ্রকাশও এই সময় থেকেই শুরু হয়। এর পরেই প্রশংসা আর তিরস্কার বুঝবার শক্তি হয়— সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসা পাবার জন্যে একটা আগ্রহও জন্মায়। দেখা গেছে, পাঁচ মাসের শিশু টেবিলের উপর থেকে একটা ভারী জিনিষ তুলতে পেরে বিজয়গর্ব্বে চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছে— যেন তার এই সাফল্যটাকে অন্যরা কিভাবে গ্রহণ করল তা বুঝবার জন্যে তার বড় আগ্রহ। যে মুহূর্ত্তে শিশুর এই বোধশক্তি জন্মায়, সেই মুহূর্ত্ত থেকে শিক্ষাদাতার হাতে আর একটা নতুন অস্ত্র এল— শিশুমনের ওপর যার ক্ষমতা অতি অসাধারণ। কিন্তু এর প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁকে খুব সাবধান হতে হবে, যেন কোন ক্রমেই অপব্যবহার না হয়। প্রথম বৎসরে শিশু তিরস্কারের তিক্ত আস্বাদ যেন মোটেই না পায়। তার পরেও যত কম তিরস্কার ক'রে পারা যায় ততই ভালো। তিরস্কারের মত প্রশংসা ততটা ক্ষতিকর নয়। শিশু এক একটী নতুন কথা উচ্চারণ করতে শিখলে বা 'চলি চলি পা পা' করে হাঁটতে আরম্ভ করলে কোন পিতামাতাই প্রশংসা না ক'রে পারেন না। বাধাবিঘ্ন জয় ক'রে শিশু কোন কিছু একটা করতে পারলে তার প্রাপ্য প্রশংসা থেকে তাকে বঞ্চিত করা উচিতও নয়। শিশুকে বুঝতে দেওয়া চাই যে তার শিখবার আগ্রহ ও চেষ্টার সঙ্গে পিতামাতার সহানুভূতি আছে। তবে প্রশংসা জিনিষটাও বেশী সস্তা হলে শেষটায় শিশুর কাছে তার কোন মূল্যই থাকে না— একথাও মনে রাখতে হবে।

প্রথম বৎসরে শিশুর বুঝবার, শেখবার ইচ্ছা আর আগ্রহ বড়দের চেয়ে অনেক বেশী হয়। পিতামাতা যদি সুযোগ সৃষ্টি ক'রে দেন সে নিজের চেষ্টাতেই শিখে নেবে। তাকে হামাগুড়ি দিতে, হাঁটতে বা কথা বলতে শেখাবার দরকার হয় না। অনেকে চেষ্টা ক'রে তাড়াতাড়ি বুলি শেখাতে চান; কিন্তু এ ভুল। আমাদের নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে সে এসব নিত্যই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। বাকীটুকু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তার নিজের চেষ্টাতেই হবে। কিছু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে যদি সে কোন কিছু একটা শিখতে পারে— তবে সেই সাফল্য তাকে আরো শিখবার আগ্রহ আর উৎসাহ এনে দেয়; আর সেই প্রেরণার জোরে সে সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়ে চলে। শুধু শিশুজীবনে কেন, বড়দের সম্পর্কেও একথা খুবই খাটে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল মানুষের জীবনেই এটা একটা অতি বড় সত্যি কথা। কাজেই নিজের চেষ্টাতে সাফল্যলাভ করবার আনন্দ থেকে যেন শিশু বঞ্চিত না হয়। তবে এমন কোন কঠিন কাজেও তাকে প্রবৃত্ত করা উচিত নয়— যা তার ক্ষুদ্র শক্তিতে একেবারেই অসম্ভব। কারণ সে ক্ষেত্রে অক্ষমতার গ্লানি তার সমস্ত উৎসাহকে ম্লান ক'রে দেবে। এখানে একথাও মনে রাখতে হবে যে, একেবারে অতি সামান্য চেষ্টায় যদি কিছু করা যায় তবে সাফল্যের যে আনন্দ ও গৌরব তার আস্বাদ শিশু পাবে না। তার শক্তির পরিমাণে কিছুটা চেষ্টা করলেই যে কাজ করা যাবে তাতেই তাকে উৎসাহিত করা উচিত। ধরুন, ঝুমঝুমি বাজানো। বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ যদি একবার দেখিয়ে দিয়ে তার শিখবার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলেন, শিশু নিজের চেষ্টাতেই তা শিখে নিয়ে একটা তৃপ্তি অনুভব করতে পারে।

এখনো পর্য্যন্ত অনেকে ভাবতে পারেন না, ঠিক জন্মের সময় থেকে আরম্ভ করে এক বৎসর বয়স পর্যন্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং পিতামাতার হাবভাব আচার-ব্যবহার থেকে শিশু সকলের অজ্ঞাতে তিলে তিলে যে শিক্ষা আহরণ করে, ভবিষ্যৎ জীবনে তার মূল্য কত বেশী।

আহার, নিদ্রা প্রভৃতি কাজ যেন শিশু নিজের প্রয়োজন বোধে করতে শেখে তার চেষ্টা করা উচিত। তাকে কোন কাজে জোর ক'রে বাধ্য না ক'রে শুধু এমন সুযোগ ও অবস্থা তৈরী ক'রে দেওয়া চাই, যাতে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়েই তা করতে পারে। External discipline জিনিষটা মোটেই ভালো নয়। Internal self-discipline-ই হচ্ছে আধুনিক শিশুশিক্ষার গোড়ার কথা। এই জিনিষটা শিশুকে প্রথম বৎসরেই যতটা সম্ভব শিখানো দরকার। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। অনেক মাতা শিশুকে দোয়া দিয়ে, গান গেয়ে, অনেক আয়োজন ক'রে ঘুম পাড়াবার বন্দোবস্ত করেন। এ অভ্যাস ভালো নয়। ঠিক সময়ে স্নানাহার শেষ করিয়ে নিরিবিলি শিশুকে বিশ্রাম করবার সুযোগ দিলে তার আপনি ঘুমিয়ে পড়া উচিত। এভাবে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঘুমাবার অভ্যাস হলে শিশু পরিপূর্ণ শান্তিতে অনেক বেশী ঘুমাবে। আহার, নিদ্রা ইত্যাদি ব্যাপারে বেশী তোষামোদের ভাব দেখালে শিশু ক্রমেই আরো বেশী খোসামোদ দাবী করতে শেখে। ঠিক সময়ে ঘুমিয়ে সে মাতাকে নেহাত অনুগ্রহ করল অথবা তাঁকে স্রেফ সন্তুষ্ট করবার জন্যেই দুধ খেল, এমন ভাব জন্মাতে না দেওয়াই ভালো। প্রথম বৎসরে শিশুর এই বোধশক্তি থাকে না, একথা মনে করা বিষম ভুল। তার জ্ঞানবুদ্ধি অস্ফুট, শক্তি কম। তা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে বুড়োদের চেয়ে সে কোন অংশে কম চালাক নয়, একথা আর একবার বলেছি। প্রথম বৎসরে তার শিক্ষা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলে। এত অল্প কালের মধ্যে এত বেশী শিক্ষা জীবনের আর কোন সময়েই হয় না। নবজাত শিশুর বুদ্ধি অতি প্রখর না হলে এটা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'ত না।

মোটের উপর ক্ষুদ্রতম শিশুর সঙ্গেও আচার ব্যবহারে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে, সন্তান গঠনের ব্যাপারে এটা হচ্ছে একটা নিগূঢ়তম সত্য। বিশেষ ক'রে শিশুর জীবনের প্রথম বৎসর সম্পর্কেই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করলাম। এই সময়ের শিক্ষায় যেমন অত্যন্ত বেশী সতর্কতা দরকার, এই দিকটায় ঠিক তেমনি আমাদের উদাসীনতাও সবচেয়ে বেশী— একথা আগেই বলেছি। আমাদের এই ভুল ধারণা ভাঙতে হবে। আমাদের প্রত্যেকটী সন্তান যেন দীর্ঘজীবী হয়ে দেশের ও দশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে— একেবারে গোড়া থেকেই প্রতি ঘরে ঘরে জননীদের এই-ই যেন সাধনা হয়।

(লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হল 'বুলবুলে'র বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৪০ সংখ্যা থেকে। লেখিকার নাম উল্লেখ ছিল শামসুন নাহার বি-এ। আমরা এখন বাহুল্যবোধে বি-এ কথাটির উল্লেখ করলাম না। বানান যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রইল।) ■

প্রতি বছর মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিকসহ নানা পরীক্ষা হয়। ফল বেরোলে সংবাদপত্রে নাম ওঠে কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রীর। গর্বিত হন বাবা-মা। গৌরব বাড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও। কিন্তু, র‍্যাঙ্ক করা ছাত্র-ছাত্রীর সাফল্যের পেছনে কী রসায়ন কাজ করে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই-বা কী ভূমিকা? এই সংখ্যায় বলছে ২০১৫ সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে আল-আমীনের মধ্যে প্রথম।

মহিদুল আফ্রিদি

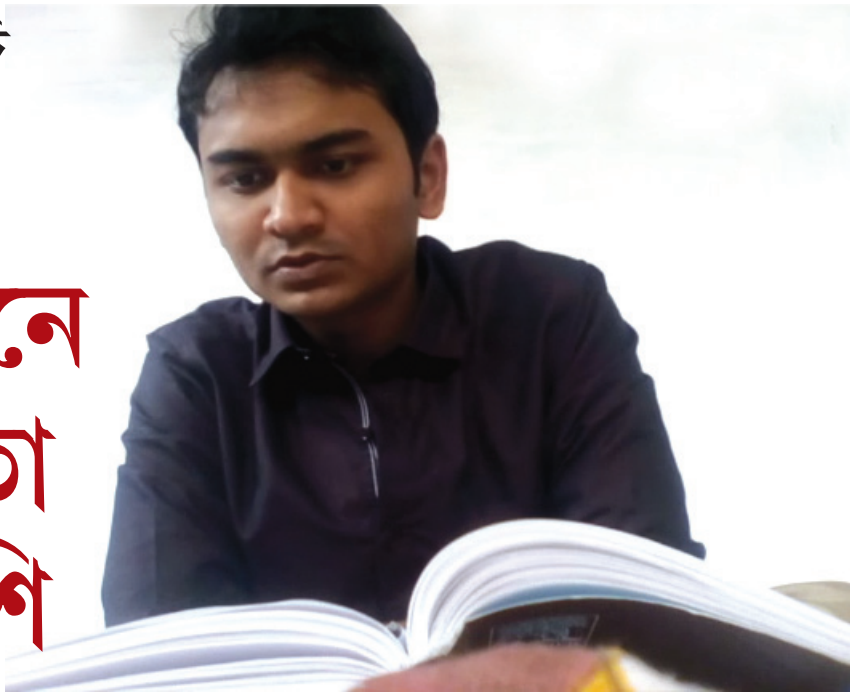

আল-আমীনে প্রতিযোগিতা অনেক বেশি

২০১৫ সালে জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে প্রথম ২৫০০ জন র‍্যাঙ্কারের মধ্যে আল-আমীন মিশন থেকে র‍্যাঙ্ক করেছিল ২৯৭ জন ছাত্র-ছাত্রী। এমবিবিএস ও বিডিএস মিলে ভর্তি হয়েছে ২৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রী। ২০১৫ সালের জয়েন্ট এন্ট্রাস মেডিকেলে আল-আমীনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সবার ওপরে আছে মহিদুল আফ্রিদি। তার র‍্যাঙ্ক ৩৬। মহিদুলের শিখর-ছোঁয়া সাফল্যের কথা এই সংখ্যার 'শিখরদেশে'র পাতায়।

❑ তোমার বাড়ি কোথায়?

● আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার কুলুড়ি গ্রামে।

❑ সালার মানে বর্ধমান লাগোয়া মুর্শিদাবাদ। ওই এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা কী?

● বর্ধমানের মতো আমাদের মুর্শিদাবাদের ওই এলাকায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে চাষবাসের একটা বড়ো ভূমিকা আছে। এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকাই হল চাষবাস। বছরে তিন বার ধান হয়। কৃষিনির্ভর জীবন বলতে পারেন।

❑ তোমাদের জমিজমা আছে না কি?

● হ্যাঁ, আছে। ওই পাঁচ-ছ বিঘার মতো।

❑ গ্রামে পড়াশোনার হার কীরকম?

● পড়াশোনার তেমন চল নেই। বড়োজোর মাধ্যমিক পর্যন্ত স্কুলে যায়। তারপর কাজে লেগে যায়।

❑ ওই চাষবাসের কাজে?

● না, ইদানীং বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ শিখতে বাইরে চলে যাচ্ছে গ্রামের ছেলেরা। জরির কাজ, জুতো তৈরি, নানান দৈনিক মজুরির কাজে চলে যাচ্ছে।

❑ এবার তোমার পরিবারের কথা বলো। বাড়িতে কে কে আছেন?

● বাড়িতে আছেন আব্বা-মা আর আমার ছোটোভাই।

❑ আব্বা-মার নাম কী? কী করেন?

● আব্বার নাম আবুল কালাম আজাদ। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। মায়ের নাম মনোয়ারা বেগম। গৃহবধূ।

❑ ভাই কী করে?

● ভাই পড়াশোনা করছে। ওর ক্লাস সিক্স হল।

❑ ও কোনো মিশনে পড়ছে, না বাড়িতে?

● না, ও বাড়িতে থেকেই পড়ছিল। তবে এ-বছর মিশনে ভর্তির পরীক্ষা দিয়েছে। পাসও করেছে। মিশনে ভর্তি হবে।

❑ এবার তোমার পড়াশোনার বিষয়ে বলো। কোথায় পড়াশোনা করেছ?

● আমার প্রাথমিক পড়াশোনা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হই সালার ই জেড এইচ এস স্কুলে। সেভেন পর্যন্ত ওই স্কুলে পড়ি। এইট থেকে টেন পর্যন্ত পড়েছি কালিয়াচক আবাসিক মিশনে। উচ্চ-মাধ্যমিক

আর জয়েন্ট কোচিং আল-আমীন মিশন থেকে।

❑ কেমন রেজাল্ট করতে?

● স্কুলে বরাবর প্রথম হতাম। কিন্তু মিশনে এসে সেটা ধরে রাখতে পারিনি। স্কুলে, প্রায় প্রতিটি স্কুলেই বলা যায়, ভালো ফল করা ছেলেমেয়ের সংখ্যা কম। ফলে একটু ভালো পড়াশোনা করলেই প্রথম দিকে র‍্যাঙ্ক করা যায়। কিন্তু মিশনে বিভিন্ন এলাকার ভালো ছেলেমেয়েরা এসে একত্রিত হয়। ফলে স্বাভাবিক কারণেই মেধাবী পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি। প্রতিযোগিতা বাড়ে। যত সহজে স্কুলে ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া যায়, মিশনে তা হয় না। আমার ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছিল। তবে প্রথম না হলেও প্রথম পাঁচ জনের মধ্যে থাকতাম। কালিয়াচক আবাসিক মিশনে মাধ্যমিকে অবশ্য ওই মিশনের মধ্যে আমিই প্রথম হয়েছিলাম।

❑ কত পেয়েছিলে মাধ্যমিকে?

● আমি মাধ্যমিক দিই ২০১২ সালে। ৬৫০ পেয়েছিলাম। ৯২.৮৬ শতাংশ। জেলায় তৃতীয় হয়েছিলাম।

❑ কালিয়াচক আবাসিক মিশন থেকে আল-আমীন মিশনে চলে এলে কেন? ওখানে কী উচ্চ-মাধ্যমিক পড়ার সুযোগ নেই?

● ওখানে এইচ এস আছে। তবু ওই মিশনের অনেকেই আল-আমীন মিশনে আসে, কারণ, জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষাটা আল-আমীন মিশন থেকে দিতে চায়, যেটা কালিয়াচকে পাওয়া যায় না। কালিয়াচক আবাসিক মিশনের অনেক ছাত্র আল-আমীনে ভর্তি হয়ে এখন ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে।

❑ আল-আমীন মিশনে কীভাবে, কোন শাখায় ভর্তি হলে?

● আমি ভর্তির পরীক্ষা দিয়েছিলাম কান্দির নবগ্রামে। লিখিত পরীক্ষায় পাস করে ইন্টারভিউ দিই খলতপুরে। খলতপুর শাখাতেই ভর্তি হই। আমি উচ্চ-মাধ্যমিক পড়ি খলতপুর শাখায় আর জয়েন্ট কোচিং নিই পাঁচুড় শাখায়।

❑ আল-আমীন মিশনে খরচের ক্ষেত্রে দুঃস্থ-মেধাবীদের জন্য যে-ছাড়ের সুযোগ আছে, তা তুমি পেয়েছিলে?

● না, আমাদের পরিবার তত ধনী নয় ঠিকই, কিন্তু আব্বা চাকরি করেন, জমিজমাও আছে পাঁচ-ছয় বিঘার মতো। তাই আমি ফুল-পেয়ি হিসেবেই পড়েছি।

আল-আমীন মিশনের আরও তিনটি বিষয় প্রভাব ফেলে প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রীর ওপর। সেগুলো হল ভালো পড়াশোনা, ইসলামি পরিবেশ আর পারস্পরিক সহযোগিতা।

❑ তুমি সরকারি স্কুলে পড়েছ। আল-আমীন মিশনেও পড়লে তিন বছর। আল-আমীন মিশনে কী কী ভালো-মন্দ দিক তোমার নজরে পড়ল?

● প্রথমত, তিনটি স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতা তিন রকমের। সাধারণ বিদ্যালয়ে ভালো পড়ুয়া কম, তাই প্রতিযোগিতা কম, কালিয়াচকে সেটা বাড়ল খানিকটা। আল-আমীনে সেটা কয়েক গুণ বাড়ল। আল-আমীন মিশনের আরও তিনটি বিষয় প্রভাব ফেলে প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রীর ওপর। সেগুলো হল ভালো পড়াশোনা, ইসলামি পরিবেশ আর পারস্পরিক সহযোগিতা।

❑ আর খারাপ?

● খারাপ তেমন কিছু নেই। তবে পড়াশোনার প্রেসার থাকে খুব। অবশ্য ভালো রেজাল্ট করতে গেলে প্রেসার নিতেই হবে।

মধ্যমণি মহিদুল।

❑ কীভাবে কোন রুটিন মেনে পড়াশোনা করতে?

● উচ্চ-মাধ্যমিকে মিশনের রুটিন বাদে আরও দু-তিন ঘণ্টা পড়তাম। পরীক্ষার আগে রাতে খানিকটা পড়তাম।

❑ উচ্চ-মাধ্যমিকে কেমন রেজাল্ট হয়েছিল?

● আমি ২০১৪ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক দিই। পেয়েছিলাম ৪৪৭ নম্বর। ৮৯.৪ শতাংশ।

❑ মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় সবাই তো রানিংয়ে, মানে উচ্চ-মাধ্যমিক দেওয়ার বছরই জয়েন্ট দেয়। তুমি দাওনি?

● হ্যাঁ, আমিও দিয়েছিলাম।

❑ র‍্যাঙ্ক হয়েছিল? কত?

● রানিংয়ে আমার মেডিকেল র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ২৪২০ আর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৫৫১৪। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হইনি। মেডিকেল এমবিবিএসে ১৭০০-র কাছাকাছি পর্যন্ত র‍্যাঙ্কের ছেলেমেয়েরা ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল।

❑ মনে হয়, আর-একটু ভালো করে পড়লে ওই বছরই ভর্তি হতে পারতে?

● হ্যাঁ, যদি একমাস জয়েন্টের জন্য খেটে পড়তাম, তাহলে হয়তো এক বছর নষ্ট হত না। উচ্চ-মাধ্যমিকটা গরুত্ব দিয়ে পড়েছিলাম।

❑ এক বছর কোচিং নিয়ে তাক লাগানো ফল হল। জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে ৩৬ র‍্যাঙ্ক। এর জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলে?

● জয়েন্টের ক্ষেত্রে কোচিংয়ের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় নিজের মতো করে তৈরি হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। সেজন্য আমার মনে হয় জয়েন্টে সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের চেষ্টার ওপর। আমি বেশির ভাগ সময়টা পড়তাম। মাগরিবের নমাজ পড়ে বসতাম। বাংলা টেক্সট বইগুলো খুঁটিয়ে পড়তাম। ইংরেজি বই সব কিনেছিলাম কিন্তু খুঁটিয়ে পড়তাম না। ইংরেজি বই থেকে এমসিকিউ প্র্যাকটিস করতাম।

❑ পড়াশোনা ছাড়া আর কী ভালো লাগে?

● সিনেমা দেখতে, গল্প-উপন্যাস পড়তে ভালো লাগে।

❑ কী কী গল্প-উপন্যাস পড়েছ? কার সিনেমা ভালো লাগে?

● আল-আমীনে আসার আগে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়েছি কয়েকটা। খলতপুরে পড়ার ফাঁকে চেতন ভগতের কয়েকটা বই, যেমন 'থ্রি মিসটেকস অব মাই লাইফ', 'টু স্টেটস', 'রেভলিউশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি' পড়েছি। আর আমার আমির খানের সিনেমা ভালো লাগে। ওঁর প্রায় সব সিনেমা দেখেছি।

❑ অসহিষ্ণুতা নিয়ে আমির খানের মন্তব্য পড়েছ?

● হ্যাঁ, পড়েছি। আমির শাহরুখকে নিয়ে মিডিয়া বাড়াবাড়ি করছে।

❑ কোথায় ভর্তি হলে?

● আমি সিএমসি-তে ভর্তি হয়েছি।

❑ ওখানে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর হার কীরকম?

● ১০-১২ শতাংশ হবে।

❑ আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রীর হার কত?

● প্রায় সবটাই। যেমন আমাদের ছাব্বিশ জনের মধ্যে আল-আমীন মিশনের বাইশ জন।

❑ মিশনের পড়ুয়া আর বাইরের পড়ুয়াদের মধ্যে কী ফারাক লক্ষ কর কলেজে?

● মিশনের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় পিছিয়ে নেই। সংস্কৃতি-চর্চায় অন্যান্যরা এগিয়ে। মিশন ইউনিটির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আরও কিছু ভালো জিনিস লক্ষ করলাম ওখানে।

❑ কীরকম?

● মিশন থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মিশন ইউনিটি বলে একটা বিষয় চালু হয়েছে। এইসব ছেলেমেয়েদের পোশাকআশাক অন্যান্যদের চেয়ে আলাদা। সকলকে সম্মান করা, সালাম দেওয়ার রীতি তৈরি হয়েছে। ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফাইনাল ইয়ার পর্যন্ত কোনো ছাত্র-ছাত্রী সমস্যায় পড়লে সব রকমের হেল্প করা হয়। খেলতে গেলেও সিনিয়র দাদাদের সঙ্গে যাই। র‍্যাগিং বিষয়টাই নেই। পলিটিকাল ইস্যুতেও কেউ থাকে না। বন্ধুদের পড়াশোনা থেকে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের চিকিৎসায় বিশেষ সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে সবাই।

❑ বাঃ, খুব ভালো ব্যাপার তো?

● হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

❑ ভবিষ্যতে কীভাবে এগোতে চাইছ?

● এমবিবিএস করে এমএস করার ইচ্ছে আছে।

❑ তোমার স্বপ্ন সফল হোক।

● ধন্যবাদ আপনাদের।

সেরার পরামর্শ

● জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে র‍্যাঙ্কের জন্য শুধু বায়োলজিতে ভালো হলে হবে না। ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি— দুটোতেও সঙ্গে-সঙ্গে ভালো হতে হবে। এই স্ট্রেন্থটা আসবে— থিয়োরিটা খুঁটিয়ে পড়বে, আর সেটার কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে, বেশি বেশি প্র্যাকটিস করা।

● বায়োলজিতে বাংলা টেক্সট বই যার যেটা আছে, সেটাই পড়বে। খুঁটিয়ে প্রতিটা লাইন পড়তে হবে। ইংরেজি টেক্সট বই পড়ে অযথা চাপ নেওয়ার দরকার নেই।

● প্রাথমিকভাবে বায়োলজি থিয়োরি পড়ে থেমে গেলে হবে না, সেই টপিকগুলোকে বার বার রিভাইস করবে। এতে কনফিডেন্স এবং এমসিকিউ সলভ করার দক্ষতা— দুটোই আসবে, কনফিউশন কমবে অপশন চুজ করার সময়।

● বায়োলজির প্রশ্নগুলো নিজের বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করবে। একে অপরের মনে রাখার ফান্ডা সেয়ার করবে। ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি— এ দুটোর জন্য থিয়োরি মনে রাখার জন্য বার বার পড়ার দরকার নেই, বিভিন্ন ধরনের এমসিকিউ প্রবলেমগুলো সলভ করবে, তাতে যেমন কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে, তেমন থিয়োরিগুলোও নিজের আয়ত্তে থাকবে।

● ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি— এর ক্ষেত্রে আগের বছরগুলোর AIPMT, AIEEE, IIT-JEE, অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন অভ্যাস করবে। বিশেষভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ক্ষেত্রে AMU-এর আগের বছরের প্রশ্নগুলোকে মডেল হিসেবে অভ্যাস করবে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির জন্য। বায়োলজিতে AMU-এর ধরন আলাদা।

● মিশনের মক টেস্ট এবং পিটির রেজাল্ট নিয়ে নিজেকে বিচার করবেই না। এটা সর্বদা আপেক্ষিক হয়। তুমি নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো, আল্লাহ্‌র কাছে বেশি বেশি করে চাও, তাহলেই সাফল্য আসবে। ■

বিচিত্র এই বিশ্বে কত তথ্য আর তত্ত্ব, তার সীমা নেই শেষ নেই কোনো। এই বৈচিত্র্যের কারণে জগৎ অপার আনন্দময় ও বিস্ময়ের। এসবের কোনোটা সংবাদ শিরোনামে আসে, কোনোটা আসে না। এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ টুকরো খবর নিয়ে এই পাতা। লিখছেন

ফরিদা নাসরিন

বহু-সীমান্তের নদী

যেসব নদনদী পৃথিবীর একাধিক দেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, ইংরেজিতে তাদের বলে ট্রান্স-বাউন্ডারি রিভার (Trans-boundary river) বা বহু-সীমান্তের নদী। এইসব নদনদী নিয়ে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে গোলমালও কম হয় না। অন্যের তোয়াক্কা না করে কেউ বাঁধ দেয়, কেউ নদীপথ ঘুরিয়ে দিতে চায়।

এমন নদী কোথায় আছে?

তার আগে বলি, সব নদীই নদী নয়। কোনো-কোনোটা নদ। যেমন অজয়, দামোদর। যেমন ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্র একটি বহু-সীমান্তের নদ বা ট্রান্স-বাউন্ডারি রিভার। ভারতীয় পুরাণে এই নদকে বলা হয়েছে ব্রহ্মার পুত্র। নাম তাই ব্রহ্মপুত্র। বহু-সীমান্তের নদ বলেই ব্রহ্মপুত্রের সমস্যা বেশি। যেমন এ-বছরই ১৩ অক্টোবর তিব্বতে ব্রহ্মপুত্রের ওপর একটি বিরাট বাঁধ দিয়েছে চীন। বলা হচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তেত্রিশ-শো মিটার উঁচুতে তৈরি এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতায় অবস্থিত বাঁধ, যেটি আসলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। এবং এখনও পর্যন্ত এটিই চীনের সবচেয়ে বড়ো বাঁধ। দৈর্ঘ্য নয় কিলোমিটার। খরচ হয়েছে ভারতীয় টাকায় মোট ন-হাজার সাতশো চৌষট্টি কোটি টাকা। শুধু এতেই তারা থেমে থাকেনি। ২০১৫-র ডিসেম্বরে একই নদের ওপর তারা আরও তিনটি বাঁধ তৈরির প্রস্তুতি নিয়েছে। ভারত এতে খুবই উদ্‌বিগ্ন। হঠাৎ বেশি জল ছেড়ে দিলে বা জলের প্রবাহ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলে অরুণাচল প্রদেশ এবং অসমের বন্যা ও খরার আশঙ্কায় প্রতিবাদও জানিয়েছে ভারত। অবশ্য চীন বলেছে, ভারতের ক্ষতি হবে, এমন কাজ তারা করবে না। বহু-সীমান্তবিশিষ্ট নদনদীর এটাই সমস্যা।

ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথটি কেমন?

উত্তর হিমালয়ে তিব্বতের বুরাঙ প্রদেশের চেমায়ুঙডুঙ হিমবাহে নদটির উৎপত্তি। ওদের ভাষায় ওরা বলে ছাংপো (অর্থ হচ্ছে, পরিশোধক বা যে পরিস্রুত করে) বা ইয়ারলুঙ (তিব্বতের একটি প্রদেশের নাম) ছাংপো নদী। তিব্বতের দক্ষিণে বয়ে এসে নদটি ঢুকেছে আমাদের অরুণাচল প্রদেশে, যেখানে নদটি দিহাঙ বা সিয়াঙ নামে পরিচিত। সেখান থেকে

পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতায় অবস্থিত এবং চীনের সবচেয়ে বড়ো বাঁধ। দৈর্ঘ্য নয় কিলোমিটার।

দক্ষিণ-পশ্চিমে বয়ে এসে অসমে পৌঁছে নাম পেয়েছে ব্রহ্মপুত্র। গুয়াহাটির পাশ দিয়ে বয়ে দক্ষিণে নেমে গেছে বাংলাদেশে, নাম হয়ে গেছে যমুনা। নদ থেকে হয়ে গেছে নদী! বাংলাদেশে পদ্মা এবং মেঘনা নদী এসে মিলিত হয়েছে এই যমুনার সঙ্গে এবং শেষমেষ মেঘনা নাম পেয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে।

দৈর্ঘ্য উনতিরিশ-শো কিলোমিটার। গড় গভীরতা একশো চব্বিশ ফুট, সর্বোচ্চ গভীরতা তিনশো আশি ফুট। ব্রহ্মপুত্র যে-জল বয়ে আনে, তার পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে ছ-লক্ষ আশি হাজার ঘনফুট।

এই নদীর ওপরেই বাংলাদেশ তৈরি করেছে 'যমুনা বহুমুখী সেতু'। লম্বায় ৫.৬৩ কিলোমিটার, যা তৈরির সময় ছিল বিশ্বে একাদশতম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ষষ্ঠতম। এতে রেল ও সড়ক পরিবহণের এমন ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে পরে ট্রান্স-এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে চালু হতে পারে।

কার্মান রেখা

মহাকাশের কথা আমরা প্রায়ই শুনি। সূর্য, চন্দ্র, অগণন তারা। ছায়াপথ, নীহারিকা-মণ্ডল— তারাও গণনাতীত। শুনি, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। সবই মহাকাশে। তা, এই মহাকাশের শুরু কোথা থেকে? কোনটাকে মহাকাশ বলব?

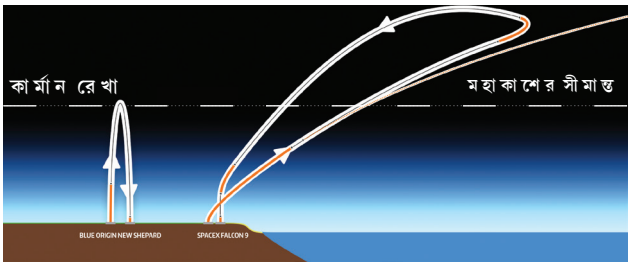

সাধারণভাবে বলা হয়, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই মহাকাশের শুরু।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কোথায় শেষ হয়েছে?

আমরা জানি, পর্বতারোহীরা এভারেস্টে উঠতে অক্সিজেন সিলিন্ডার বয়ে নিয়ে যায়। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বাতাস সেখানে নেই। তাহলে কি পর্বতারোহীদের মহাকাশচারী বলব? না। অনেক ওপর দিয়ে যেসব এরোপ্লেন উড়ে যায়, সেইসব প্লেনেও কৃত্রিমভাবে বায়ুচাপ বজায় রাখতে হয়। কিন্তু এরোপ্লেনকেও আমরা মহাকাশযান বলি না।

কেন? আসলে এভারেস্টের চূড়াতেও বায়ুমণ্ডল আছে। তবে সেখানকার বায়ুচাপ সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুচাপের তিন ভাগের এক ভাগ, তাই অক্সিজেনের পরিমাণও তিন ভাগের এক ভাগ। এরোপ্লেন যে-উচ্চতায় ওড়ে, সেখানেও বায়ুমণ্ডল রয়েছে। আর, আছে বলেই ডানায় ভর করে উড়ে যেতে পারে। তবে বাতাসের চাপ কম হওয়ায় যাত্রীদের সুবিধার জন্য এরোপ্লেনের ভেতর কৃত্রিমভাবে বায়ুচাপ বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।

ওপরে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে বায়ুস্তর পাতলা হতে থাকলেও পৃথিবী থেকে দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল রয়েছে। যাকে আমরা মহাকাশ বলি, তাহলে কি তার শুরু দশ হাজার কিলোমিটারের পর থেকে?

মহাকাশের শুরু কোথা থেকে ধরা হবে, এটা কিছুটা সংজ্ঞার ওপর নির্ভর করছে। এই সংজ্ঞাটি প্রস্তাব করেন থিয়োডোর ভন কার্মান (Theodor Von Karman) নামে এক হাঙ্গেরীয়-আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী।

এরোপ্লেন উড়তে শুরু করলে ডানার ওপর একটা ঊর্ধ্বমুখী বল তৈরি হয়, যে-কারণে প্লেন উড়তে পারে। যত ওপরে ওঠে, বায়ুস্তর পাতলা হয় এবং ঊর্ধ্বমুখী বলের পরিমাণও কমতে থাকে। সেই বলের জোগান দিতে গিয়ে এরোপ্লেনকে আরও দ্রুত চলতে হয়। থিয়োডোর ভন কার্মান হিসেব কষে দেখান, একশো কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুস্তর এতটাই হালকা হয়ে যায় যে, সেখানে এরোপ্লেনের পক্ষে আর ডানায় ভর করে ওড়া সম্ভব নয়। ওই উচ্চতায় এরোপ্লেন ওড়ানোকে কক্ষপথে রকেটের ছুটে চলার সঙ্গে তুলনা করা যায়। মূলত এ-কারণেই একশো কিলোমিটারের পরের এলাকাকে কার্মান মহাকাশ হিসেবে বিবেচনা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই প্রস্তাব আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃত হয়েছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে একশো কিলোমিটার উচ্চতায় একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে, ওই বিজ্ঞানীকে সম্মান জানানোর জন্যে যেটির নাম দেওয়া হয়েছে 'কার্মান রেখা' (Karman line)।

এখন আমি যদি ওই কার্মান রেখা পেরিয়ে যাই, বলতেই পারি— আমি মহাকাশে পৌঁছে গেছি এবং আমি একজন মহাকাশচারী। কার্মান রেখার এপারটা বিমানবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। ওপারটা মহাকাশযানবিদ্যার অসীমতা নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। সবাই মেনে নিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনী অন্য হিসেব মানছে। ওরা বলছে, বায়ুমণ্ডলের যে-এলাকা থেকে বাতাসের চাপ প্রতি বর্গফুটে এক পাউন্ডের কম, সেখান থেকেই মহাকাশের শুরু। ওদের হিসেবে এই উচ্চতা দাঁড়ায় একাশি কিলোমিটার। পরীক্ষামূলক ওড়ার ক্ষেত্রেও ওই উচ্চতা যে পেরোবে, তাকেই তারা মহাকাশচারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

একটা বাড়তি হলেও জানার কথা: আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রটি রয়েছে চারশো কিলোমিটার উচ্চতায়। অর্থাৎ কার্মান রেখারও তিনশো কিলোমিটার ওপরে।

জাফরান

বাঙালির প্রিয় ডিশগুলোর তালিকায় বিরিয়ানি এখন এক নম্বরে। কলকাতার রেস্তরাঁগুলোয় শয়ে শয়ে প্লেট বিরিয়ানি নিত্যদিন উড়ে যাচ্ছে। সোনালি-হলুদ রঙে ছোপানো এক প্লেট ধূমায়িত বিরিয়ানি যে-সুবাস নিয়ে আসে, তার তুলনা নেই। কত যে মশলার সৌহার্দ্যে আর মাংসের আত্মনিবেদনে বাসমতী চাল পক্ক হয়ে বিরিয়ানিতে রূপান্তরিত হয়, বলে বোঝানো যায় না। কিন্তু, ওই যে সোনালি-হলুদ রং, ওটি আসে কোত্থেকে, আমরা সবাই জানি। আসে জাফরান থেকে। সত্যিই কি জাফরান থেকে? রেস্তরাঁগুলো ঠকায় না তো! কৃত্রিমভাবে তৈরি কিছু দেয় না তো, যা আসল জাফরানের কিছুটা কাছাকাছি রং আর স্বাদ আনে?

আমরা কেউ জানি না। কিন্তু সন্দেহ করতে পারি। কেন সন্দেহ?

জাফরান জমিতে ফলে। ফসলের মধ্যে জাফরানই দুনিয়ার সবথেকে দামি। এরচেয়ে দামি আর কোনো কৃষিজাত দ্রব্য নেই। মাত্র এক পাউন্ড জাফরান উৎপাদনের জন্যে কমপক্ষে একটা ফুটবল মাঠের আয়তনের জমি লাগে। কেননা, পঞ্চাশ হাজার থেকে পঁচাত্তর হাজার ফুল লাগে ওই এক পাউন্ড শুকনো জাফরান পেতে।

স্যাফ্রন, জাফরান, কেশর— নানা নামে মশলাটিকে আমরা চিনি।

জাফরান Crocus Sativas গোত্রের সপুষ্পক উদ্ভিদ। ইংরেজি নাম Saffron Crocus। যদিও উদ্ভিদটি প্রথম পাওয়া গিয়েছিল গ্রিসে এবং ব্রোঞ্জ যুগ থেকেই এর ব্যবহার শুরু করে মানুষ। ভারতে আসে তুর্কিদের হাত ধরে। এবং চাষ শুরু হয় কাশ্মীরে। আন্তর্জাতিক বাজারে কাশ্মীরের জাফরানের প্রায় সমান দাম স্পেনের লা মাঞ্চা অঞ্চলের জাফরানের, যদিও লা মাঞ্চার জাফরানের কদর দুনিয়ায় একটু হলেও বেশি। জাফরান চাষে স্পেন এত দক্ষ হল কী করে? মধ্যযুগে আরব সুলতানদের উৎসাহে। এক গ্রাম ভালো কাশ্মীরি জাফরানের দাম গড়পড়তা চারশো টাকা। কিন্তু, বাড়িতে বিরিয়ানি রান্নার জন্যে যে জাফরান-কৌটো আমরা কিনি, তার দাম গড়ে নব্বই থেকে দেড়শো টাকা। তাহলে? রেস্তরাঁর বিরিয়ানি যতই সুস্বাদু হোক, তাতে কোন জাফরান থাকে, বোঝাই যাচ্ছে! ■

শিখরের কাছাকাছি যারা, যারা উজ্জ্বলতর জীবন-জীবিকার জগতে একদিন পৌঁছোবে অবশ্যই— সেই সম্ভাবনাময়দের নিয়ে এই পাতা। লিখেছেন

সেলিম মল্লিক

তিমিরবিনাশী আলো

চলতি বছরে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে মহম্মদ মনিরুজ্জামান মণ্ডল। তার জন্ম ১৯৯৮ সালে বীরভূম জেলার নলহাটি থানার ভবানীপুর গ্রামে। ভবানীপুর মুসলমান-প্রধান গ্রাম। এই গ্রামের মানুষজনের জীবনে বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির মূল প্রবাহের তরঙ্গ আজও তেমন আন্দোলন জাগাতে পারেনি হয়তো। আজও এখানকার অধিকাংশের জীবন ভাগ্যবিড়ম্বিত। বলা যেতে পারে, মহত্তের প্রেরণা থেকে বঞ্চিত এরা। এরকম এক পরিমণ্ডলের মধ্যে জন্ম নেয়া মনিরুজ্জামানের আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্পে প্রদীপ্ত। তার বাবা মহম্মদ মনিরুদ্দিন মণ্ডল, পেশায় কৃষিজীবী। মা নিলুফা বিবি গৃহবধূ। কম বয়েসে দাদু মারা যাওয়ায় খুব ছোটোবেলা থেকেই মনিরুজ্জামানের বাবাকেই সংসারের দায় নিতে হয়, আর্থিক অনটনের সঙ্গে চলতে হয় হাত-ধরাধরি করে। মনিরুজ্জামান প্রাইমারিতে পড়ত গ্রামের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। কিন্তু মেধাবী মনিরুজ্জামানের চাই সুষ্ঠু পরিবেশের শিক্ষায়তন আর শান্ত মানসিক আবহাওয়া, যার সহজ ঠিকানা, অন্তত মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্য, আল-আমীন মিশন। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা যেখানে কোনো চিন্তার কারণ নয়। অন্তরের সম্বল উজাড় করে দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের স্বপ্নময় পড়ুয়াদের হাত ধরে, মিশন তাদের পৌঁছে দেয় চাঁদের দেশে। মনিরুজ্জামানও সেই অসামান্য আলোপথের যাত্রী। পঞ্চম শ্রেণিতে মিশনের পাথরচাপুড়ি শাখায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ২০১৪ সালে মাধ্যমিক পাশ করে ৬৩৯ নম্বর পেয়ে, এখন পড়ছে খলিশানি শাখায়। ফিজিক্স তার প্রিয় বিষয়। ফিজিক্সের পাতায় পাতায় ডুব দিয়ে সে তলিয়ে যেতে পারে জগতের অনন্ত রহস্যের গভীরে। এই রহস্যের স্পর্শে সে এক আত্মিক শুদ্ধিও অনুভব করে। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার অন্তরের স্বরূপ আন্দাজ করা যায়, যখন সে বলে, প্রকৃতির সান্নিধ্য তার সব চাইতে ভালো লাগে। এর ভেতর দিয়েই বোধ হয় মনিরুজ্জামানের অনুরাগ জন্মেছে বিভূতিভূষণের গল্প আর জীবনানন্দের কবিতায়। এমনতরো অনুরাগ-হেতু এটা স্পষ্ট, শুধু শিক্ষা নয়, সংস্কৃতির গভীরে তার মনের যোগ। একটা জাতির জীবনে এরকম সন্তানেরাই তো তিমিরবিনাশী আলো।

মহম্মদ মনিরুজ্জামান মণ্ডল।

উত্তরণের সিঁড়ি

ছোটোখাটো চেহারার স্বভাবত অন্তর্মুখী সাফিউল ইসলাম এখন আল-আমীন মিশনের পাঁচুড় শাখার ছাত্র, এ-বছর উচ্চ-মাধ্যমিক দেবে। সাফিউলের জন্ম ১৯৯৮ সালে। বাবা নজরুল ইসলাম, মা ছাবিলা বিবি। নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার জোড়তলা গ্রামে। দশ-বারো বছর আগেও সাফিউলদের বাস ছিল পরাশপুরে, যা এখন পদ্মার শাখার গর্ভে তলিয়ে গেছে, যেখানে ছিল তার কৃষিজীবী দাদুর চাষজমি, যা হয়তো নদীর ভাঙাগড়ার নিয়মে আবার একদিন জেগে উঠবে পরাশপুরের চর হয়ে। ভাগ্যতাড়িত মানুষ সুদিনের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকেন হাত-পা গুটিয়ে, আর যিনি স্বপ্নময়, তিনি খুঁজে নেন জীবনের নতুন পথ। যেমন সাফিউলের দাদু ভূমি হারিয়ে নিজের সন্তান, অর্থাৎ সাফিউলের বাবার জীবনে শিক্ষার ভূমিকা এনে দিয়েছেন, যার দরুন তিনি আজ শিক্ষক, আর তাঁর ছয় ছেলেমেয়েও শিক্ষাকে উত্তরণের একমাত্র সিঁড়ি হিসেবে গ্রহণ করেছে। চিরকাল ভালো ফল করা ছাত্র সাফিউল প্রথম আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয় নবম শ্রেণিতে, বেলপুকুর শাখায়। মিশনে এসে তার মেধা যেন সত্যিকারের প্রতিভায় প্রকাশ পেতে শুরু করল। কথায় বলে না, ফসল যতটা গাছের, ততটাই মাটির দান। আল-আমিন মিশন হল সেই মাটি, যেখানে সাফিউলেরা আরও আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। ২০১৪ সালে সে মাধ্যমিকে ৬৩৮ নম্বর পায়। ভবিষ্যতে ডাক্তারি পড়তে চাওয়া সাফিউল তো বিজ্ঞানে বেশি নম্বর পাবেই। তবু আলাদা করে উল্লেখ করতে ইচ্ছে করছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তার ৯৭ নম্বর পাওয়াটা। কথায় কথায় সে জানাল, জীবনে ভাষার মূল্য অসীম, ভালো করে ভাষাটাকে আয়ত্ত করতে হবে, কারণ, ভাষাই তো ভাব এনে দেয়, আর মহৎ ভাব ছাড়া জীবন বৃথা। সত্যি-সত্যি বিস্মিত হলাম, যখন সে জানাল: আসরের নমাজ পড়বার পর রোজদিন জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে দূরে সূর্য ডুবছে, প্রকৃতিকে খুব মায়াবী লাগছে, এবং এই মায়ার মধ্যে আছে চিরসত্য, তাই তখন এত ভালো লাগে।

সাফিউল ইসলাম।

উজ্জ্বল উদ্ধার

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রাইদিঘি থানা এলাকার কৌতলা গ্রামের তানজিজুল হক তালুকদার এবং আমিনা বিবির প্রথম সন্তান তৌহিদ আখতার তালুকদার। যে এখন একাদশ শ্রেণির ছাত্র, পড়ছে আল-আমীন মিশনের খলিশানি শাখায়। ২০১৫-তে মিশনের হাসনেচা শাখা থেকে মাধ্যমিক পাশ করে ৬৫০

আল-আমীন মিশনের কল্যাণে কতিপয় তৌহিদেরা হল উজ্জ্বল উদ্ধার। স্বভাবত মগ্ন তৌহিদ রসায়ন পড়তে ভালোবাসে আর ভালোবাসে ইংরেজি ভাষার সাহিত্য পড়তে, যার মধ্যে দিয়ে সে সারা পৃথিবীর মনন আর ভাবুকতার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়।

নম্বর পেয়ে। বলবার মতো নম্বর পেয়েছিল পদার্থবিজ্ঞানে, ১০০-র মধ্যে ৯৯। আসলে তৌহিদেরা যা পেয়েছে, তা নিশ্চয় তাদেরই অধ্যাবসায়ের অর্জন, তবু তার ওপর পরিবেশের অবদান ততদূর তাৎপর্যপূর্ণ, যতখানি পরিচর্যার দরুন ঊষর ভূমিতে ফুল ফোটে। কথাটার সার্থকতা যাচাই করতে হলে যেতে হবে যেকোনো নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলমান জনপদে, আর কথা বলতে হবে সেখানকার কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে। দেখা যাবে তাদের মধ্যেও

তৌহিদ আখতার তালুকদার।

আছে অমিত সম্ভাবনা, শুধু আনুকূল্যের অভাবে সব কেমন হেলায় বিনষ্ট হচ্ছে। আল-আমীন মিশনের কল্যাণে কতিপয় তৌহিদেরা হল তাদের উজ্জ্বল উদ্ধার। স্বভাবত মগ্ন তৌহিদ রসায়ন পড়তে ভালোবাসে আর ভালোবাসে ইংরেজি ভাষার সাহিত্য পড়তে, যার মধ্যে দিয়ে সে সারা পৃথিবীর মনন আর ভাবুকতার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। কল্পনা তার অন্তরঙ্গ উদ্ভাবন, যাতে করে সে বাস্তব আর অতিবাস্তবকে এক আধারে ধরতে পারে। সে যখন বলে, সত্য হল অর্ধেক বাস্তব অর্ধেক কল্পনা, তখন বুঝতে পারি তার চৈতন্যের ধারা বহুদূর আবহমানের সঙ্গে যুক্ত। একে নিশ্চয়ই আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে দেখবে ভাবী কাল, সেদিন কিঞ্চিৎ গৌরবান্বিত হবে এই সামান্য কলমচিও।

জীবনের অঙ্গীকার

শামস তনবীর মোল্লা।

সুদূর বিহার প্রদেশ তার পিতৃ-পিতামহের ভূমি। কিন্তু সে পুরোদস্তুর বঙ্গসন্তান। খাঁটি রাঢ়ী উচ্চারণে বাংলা বলে। পড়াশোনা করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে। তার নাম শামস তনবীর মোল্লা। জন্ম ১৯৯৯ সালে। বাবা তনবীর আলম মোল্লা। মা নাদিরা বেগম। নিবাস দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর থানা এলাকার উত্তর পদুয়া গ্রাম। শামস তনবীরের বাবা পেশায় লেপ-বালিশ-তোশকের ব্যবসায়ী। গত পঁয়তিরিশ বছর ধরে বাংলার বাসিন্দা। শামসের দাদু ও-প্রদেশে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ও-প্রদেশ অর্থাৎ বিহারের বেগুসরাই জেলার বরওনি থানার নিজ্জা গ্রাম। শামসও ওখানে খুব ছোটোবেলায় প্রাইমারি স্কুলের প্রথম পাঠ নিয়েছিল। সেই যা শুরুতেই, তারপর থেকে বাংলার স্কুলে তার পাঠগ্রহণ। চিরদিন ক্লাসে প্রথম হওয়া শামস ২০১৩ সালে নবম শ্রেণিতে আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়। প্রথমে হাসনেচা শাখায়, সেখান থেকে ২০১৫ সালে মাধ্যমিক দেয়, তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৪২। বর্তমানে মিশনের পাঁচুড় শাখায় পড়ছে, ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নে প্রদীপ্ত এখন তার সমস্ত কৈশোরক প্রত্যয়। তবে নিজের অন্তরের সমূহ সম্ভাবনার বিকাশ যে শিক্ষা, সেদিকে তার পূর্ণ হুঁশ আছে। মাধ্যমিকে জীবনবিজ্ঞানে পেয়েছে সর্বোচ্চ নম্বর— ৯৯। শামসের বাড়িতে, ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে হিন্দিতে, এ-হেন শামসের মাধ্যমিকে বাংলায়

ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নে প্রদীপ্ত এখন শামসের সমস্ত কৈশোরক প্রত্যয়। তবে নিজের অন্তরের সমূহ সম্ভাবনার বিকাশ যে শিক্ষা, সেদিকে তার পূর্ণ হুঁশ আছে।

৮৫ নম্বর পাওয়া খুব একটা কম কথা নয়। তবে সে হিন্দি ভাষায় রচিত কবিতা গল্প পড়তে ভালোবাসে, তবু রবীন্দ্রনাথ তার প্রাণের কবি। সংগীত আর চলচ্চিত্রের প্রতি তার অনুরাগের কথা জানাতে গিয়েও শামস কেমন নিজেকে গুটিয়ে নিল, কিন্তু এই প্রতিবেদকের বুঝে নিতে বাকি থাকল না, শামসের মতো নতুন প্রজন্মের সোনার টুকরো ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সঙ্গে নিজেদের জীবনে অঙ্গীকার করেছে সংস্কৃতির ভূমিকা। ■

শুরু হল নতুন বিভাগ। আসলে নানান টুকরো-টুকরো বিভাগের সমন্বয়। রত্নে ভরা আলিবাবার গুহা যেন। দেখা যাক, কী সেইসব রত্ন।

দেশ

ম ঙ্গো লি য়া

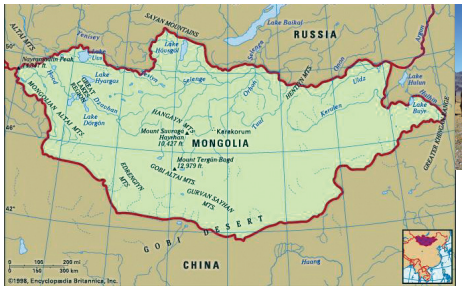

চেঙ্গিজ খান নামের এক দুর্ধর্ষ মানুষ আজ থেকে আটশো বছর আগে সারা এশিয়া মহাদেশ এবং পূর্ব ইউরোপ কাঁপিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মোঙ্গাল সাম্রাজ্যের। শুধুমাত্র স্থলপথে অভিযান চালিয়ে দুনিয়ায় এত বড়ো সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে আর-কেউ পারেনি। চেঙ্গিজ খান এসেছিলেন মঙ্গোলিয়া নামের এক অখ্যাত দেশ থেকে। সে-দেশের লোকদের বলা হয় মোঙ্গাল।

আমাদের দেশে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর। ইতিহাসে তাঁরা মোগল বা মুঘল নামে খ্যাত। আসলে বাবর মোগল ছিলেন না। ছিলেন তুর্কি, তৈমুর লঙের বংশধর। তবে তাঁর মাতৃকুল ছিল মোঙ্গাল। এবং তিনি মোঙ্গালদের ঘোর অপছন্দ করতেন। তবু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, তাঁর বংশ মোঙ্গাল, ভারতীয় উচ্চারণে মোগল নামে বিখ্যাত হয়ে যায়। চেঙ্গিজের মঙ্গোলীয় নাম তেমুজিন। এবং আজও তিনি সে-দেশের জাতীয় বীর।

কেমন সেই দেশটি? এখনকার মঙ্গোলিয়া চারদিক স্থল দিয়ে ঘেরা। আয়তন এক কোটি ছাপান্ন লক্ষ ছ-হাজার বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা তিরিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো এগারো জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ১.৯২ জন মানুষের বাস। এরচেয়ে কম জনঘনত্ব শুধুমাত্র গ্রিনল্যান্ড আর ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের। এ ছাড়াও আর-এক মঙ্গোলিয়া আছে, যাকে ইংরেজিতে ইনার মঙ্গোলিয়া বলে। সেটিও আয়তনে বিশাল এবং বর্তমান চীনের একটা প্রদেশ। এখানেই রয়েছে চেঙ্গিজ খানের সমাধি।

আমাদের আলোচ্য স্বাধীন মঙ্গোলিয়া, যার রাজধানী উলানবাটোর। দেশটির প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষের বাস উলানবাটোরেই। স্থল দিয়ে ঘেরা মঙ্গোলিয়ার উত্তরে রাশিয়া, বাকি তিন দিকে চীন। তবে পশ্চিম সীমান্তে মাত্র ছত্তিরিশ কিলোমিটার চীনা ভূমি পেরোলেই কাজাখস্তান। দেশের ৯৫ শতাংশ মানুষ জাতিতে মঙ্গোলীয়, কাজাখস্তান আর তুভান মিলে তুর্কিরা ৪.৫ শতাংশ। বাকিরা রুশ, চীনা ইত্যাদি। ভাষার অনুপাতও তেমনই। লিপি সিরিলিক। অর্থাৎ রাশিয়া, কাজাখস্তান, বুলগেরিয়া, বসনিয়া ইত্যাদি দেশের চালু হরফ।

দেশটির ইতিহাস কেমন? বহু যাযাবর জাতি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে দেশটিতে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জিওঙনু সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ থেকে ৯৩ খ্রিস্টাব্দ), জিয়ানবেই সাম্রাজ্য (৯৩—২৩৪), রৌরান খাজানেত (৩৩০—৫৫৫) এবং তুর্কি খাজানেত (৫৫৫—৮৪০)। খিতান জাতি ৯০৭ থেকে ১১২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিরাট এলাকা জুড়ে শাসন করে, যারা মঙ্গোলিয়ার আশপাশে পূর্ব রাশিয়া, চীন এবং উত্তর কোরিয়াকেও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিল। ১২০৬-এ চেঙ্গিজ খান মোঙ্গাল জাতিকে একত্র করেন। এরপর বৌদ্ধ ধর্মের আগমন। ১২২৭-এ চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুর পর তাঁর তৈরি বিশাল মোঙ্গাল সাম্রাজ্য টিকে ছিল ১২৭৯ সাল পর্যন্ত। তারপরই সেটি চার খণ্ড হয়ে যায়। সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে চেঙ্গিজের পৌত্র কুবলাই খান ১২৭১-এ প্রতিষ্ঠা করেন যে ইউয়ান সাম্রাজ্য, সেটি মূলত চীন ও মঙ্গোলিয়ায়।

চেঙ্গিজ খান।

এইভাবে মোঙ্গালরা ভাঙতে ভাঙতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত টিকে থাকে মঙ্গোলিয়ায়। কিন্তু ততদিনে মোঙ্গালরা মঙ্গোলিয়াকে দিয়ে যায় একটা সুগঠিত আইন, লেখার ভাষা এবং ঐতিহাসিক গর্ব। এরপর কিছুদিন রাশিয়ার অধিকারে চলে যায় দেশটি। পরে কিঙ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, যেটি চলে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রাশিয়া এবং চীনের চাপ প্রায় দুশো বছর আটকে রাখতে পেরেছিল দেশটি। রুশ বিপ্লবের পর বর্তমান মঙ্গোলিয়া চলে যায় পরোক্ষভাবে সোবিয়েত ইউনিয়নের অধীনে। নাম হয় মঙ্গোলিয়ান পিপলস রিপাবলিক। আর চীন দখল করে নেয় মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণ অংশ, যেটি এখন চীনের একটি প্রদেশ। গত শতাব্দীর নয়ের দশকে সোবিয়েত ভেঙে গেলে মঙ্গোলিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পুনর্গঠিত হয় এবং ১৯৯০-এর জুলাই মাসে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশটি আধুনিক জগতে প্রবেশ করে।

রাজধানী উলানবাটোর।

তবু, মঙ্গোলিয়ার প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ আজও যাযাবর। তাদের প্রধান বাহন মঙ্গোলীয় ঘোড়া। আর গোবি মরুভূমিতে রয়েছে ব্যাকট্রিয়ান উট। কৃষিকাজের সুবিধে বিশেষ নেই। কেননা, উত্তরে পার্বত্য ভূমি আর দক্ষিণে বিশাল গোবি মরুভূমি। শীতপ্রধান দেশ। খাদ্যাভ্যাসও তেমনই। মঙ্গোলীয়রা সবজি বা মশলা তেমন খায় না। দুধ ও দুধজাত খাবার আর মাংসের ওপর বেশি নির্ভরশীল।

এটা প্রায় ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে যে, মঙ্গোলিয়ার প্রায় ৩৮.৬ শতাংশ মানুষ কোনো ধর্মই মানে না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী, যে-ধর্ম এসেছিল তিব্বত থেকে। আর, তাই তারা বজ্রযানী বৌদ্ধ। সংখ্যায় ৫৩ শতাংশ। তারপরই রয়েছে সামানীয়রা। এদের উপাস্য মূলত আকাশ। কিন্তু ক্রমে এরা আকাশের অবতাররূপে অথবা সরাসরি ঈশ্বররূপে চেঙ্গিজ খানের উপাসনা করে। এদের সংখ্যা ৪ শতাংশ। ইসলাম ধর্মাবলম্বী ৩ শতাংশ। এরা মূলত কাজাখ। অল্প কিছু খ্রিস্টানও রয়েছে দেশটায়।

নেহা চৌধুরী

ভাষা

জা পা নি

এই মুহূর্তে যে ক-জন বিশ্বখ্যাত কবি-সাহিত্যিক রয়েছেন, তাঁদের অন্যতম হারুকি মুরাকামি। দুনিয়া জুড়ে বিক্রি হয় তাঁর বই। নানা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তাঁর লেখা। এমনকী আমাদের বাংলা ভাষাতেও। লেখেন উপন্যাস ও ছোটোগল্প। আর, লেখেন জাপানি ভাষায়।

কেমন ভাষা সেটি?

জাপানের মানুষ কথা বলে যে-ভাষায়, তাকেই আমরা বলি জাপানি। কিন্তু, আমরা বা দুনিয়ার সবাই ভাষাটিকে 'জাপানি' বললেও প্রকৃত নাম 'নিহোঙ্গো'। অর্থাৎ, যাদের এটি মাতৃভাষা, তারা বলে নিহোঙ্গো। আমরা অবশ্য বোঝার সুবিধের জন্যে জাপানিই বলব।

কত সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা এটি? বা কত মানুষ কথা বলে এই ভাষায়?

প্রায় একশো পঁচিশ মিলিয়ন বা বারো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের ভাষা এটি। সংখ্যাটি কম নয় কিন্তু!

মানুষের যেমন পরিবার থাকে, ভাষারও পরিবার আছে। যেমন বাংলা ভাষারও রয়েছে। বংশলতিকা খুঁজলে জানতে পারব, আমাদের বাংলা ইন্দো-এরিয়ান ভাষা-পরিবারের একটি শাখা। তেমনই এশিয়ার একেবারে পূর্ব প্রান্তের এই ভাষাটির, অর্থাৎ জাপানির, বর্তমান রূপটি এসেছে জাপোনিক বা রিউকিউয়ান ভাষা-পরিবার থেকে। এটি আবার আলতাইক ভাষা-গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

জাপানি বহু পুরোনো ভাষা। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে, অর্থাৎ এক হাজার সাতশো বছর আগেও মানুষ এই ভাষায় কথা বলত। তার প্রমাণ চীনা-সূত্রে পাওয়া যায়।

চীন হচ্ছে জাপানের প্রতিবেশী দেশ। আর তাই, হেইয়ান যুগে, যেটি ৭৯৪ থেকে ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল, ক্রমে ক্রমে চীনা প্রভাব পড়ে জাপানি ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞানের আর উচ্চারণের ওপর। মধ্যযুগে, অর্থাৎ ১১৮৫ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অন্যান্য ভাষার ছোঁয়া পেতে শুরু করে জাপানি। বিশেষ করে ইউরোপীয় ভাষার। কেননা, ততদিনে সমুদ্রপথে আর স্থলপথেও পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ইউরোপীয়রা।

এইভাবে ভাষার নানা ভাঙাগড়া চলতে চলতে সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্বে এসে প্রামাণ্য জাপানি ভাষার স্পষ্ট একটা রূপ গড়ে ওঠে। খেয়াল করলে দেখব, আমাদের বাংলাভাষার প্রামাণ্য রূপটি গড়ে ওঠার সময় মোটামুটি এই সময়েই।

এই যে প্রামাণ্য জাপানি, এটা গড়ে উঠেছিল জাপানের কানসাই এলাকা থেকে এদো এলাকার মধ্যে, যে-এলাকায় রয়েছে অতিকায় তোকিয়ো শহরটি, যাকে আমরা বলি টোকিয়ো। এ-ক্ষেত্রেও মিল রয়েছে আমাদের সঙ্গে। আমাদের প্রামাণ্য বাংলা গড়ে উঠেছে বৃহত্তর কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করেই।

সব ভাষাতেই ঢুকে আছে প্রচুর বিদেশি শব্দ। রয়েছে বিদেশি প্রভাবও। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রচুর ইউরোপীয় শব্দ, বিশেষ করে ইংরেজি, ঢুকতে শুরু করে। এবং সেই সংখ্যা আজও বেড়েই যাচ্ছে।

জাপানিরা সংখ্যা লেখে মূলত ইংরেজিতে, যে-সংখ্যা আন্তর্জাতিকভাবে অ্যারাবিক নিউমেরালস নামে অভিহিত। কেননা, এই সংখ্যা এবং তার বিন্যাসপদ্ধতি, অর্থাৎ ১,২,৩,৪— এই ক্রমটি স্পেনের মুসলমান শাসনের সময় পণ্ডিতদের মাধ্যমে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। রোমান সংখ্যার জটিলতা থেকে সংখ্যাকে সহজ করে লেখার জন্য আরবদের সহজ গণনাপদ্ধতিকে তারা নিজের করে নিয়েছিল। তবে, সেসব অন্য কথা।

জাপানিরা মাস গোনে আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার মেনেই। কিন্তু আমাদের মতো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি বলে না। বলে সংখ্যা দিয়ে। যেমন জানুয়ারিকে বলে ইচি-গাৎসু। ইচি মানে প্রথম, গাৎসু মানে মাস। এমনই অক্টোবর হল গিয়ে জু-গাৎসু। দশম মাস। নভেম্বর— জু-ইচি-গাৎসু। এগারোতম মাস।

যে-আঁকাবাঁকা ছবির মতো জাপানি লেখা আমরা দেখি, তার হরফ দুই ধরনের— হিরাগানা আর কাতালানা। কিন্তু জাপানি লিখনপদ্ধতি অক্ষরনির্ভর নয়। অর্থাৎ অ আ ই ঈ— এরকম স্বরধ্বনি, বা, ক খ গ ঘ-এর মতো ব্যঞ্জনধ্বনিনির্ভর নয়। অর্থনির্ভর। একটি সম্পূর্ণ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যেমন অর্থ বোঝায়, যেমন 'খাওয়া', তেমনই ওরা খাওয়ার ছবি এঁকে লিখত শব্দটি। সেই ছবির জটিলতাকে সরল করতে করতে কয়েকটি রেখায় নামিয়ে এনে এখন লেখে, যাতে খাওয়াটি বোঝায়।

একটা ভাষা ভালো করে জানলে সেই ভাষার মানুষদের ইতিহাসও জানা যায়। যেমন ধরা যাক কলকাতার মানুষে-টানা রিকশা। এটি এসেছে জাপান থেকে হংকং হয়ে। 'রিকশা' শব্দটি তাই জাপানি। উৎস না জেনেই আমরা অহরহ ব্যবহার করি। মানুষে-টানা রিকশাকে জাপানিরা বলে— জিন-রিকশা, অর্থাৎ মানুষে-টানা দ্বিচক্রযান। কী করে লিখবে ওরা? একটি মানুষের ছবি অর্থাৎ সাংকেতিক চিহ্ন আঁকবে আর আঁকবে রিকশার চিহ্ন। লেখাটা দাঁড়াবে এমন:

জিন-রিকশা=人力車।

人= মানুষ

力= টানা

車= রিকশা ।

এখন আমি জাপানি ভাষার ইতিহাস পড়ব=

今私は日本語の歴史をお読みください

এখন আমি= 今私 は

জাপানি ভাষার= 日本語

ইতিহাস= の歴史を

পড়ব= お読みください

এমন অসংখ্য সাংকেতিক চিহ্ন বা চরিত্র (ক্যারেক্টার) জাপানি লেখায়। অনেক চেষ্টার পর ১৯৪৬ সালে সংস্কার করে অজস্র সাংকেতিক চিহ্ন কমিয়ে এখন সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে আঠারোশো পঞ্চাশে। ভেবে দেখো, বেশির ভাগ ভাষার বর্ণমালার বর্ণ কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে। সেখানে জাপানিদের কত কত হরফ মুখস্থ রাখতে হয়।

এই যে আঠারোশো পঞ্চাশটি চিহ্ন দাঁড়াল, একে বলে তোয়ো কাঞ্জি। শিক্ষার বিস্তার করতে গিয়ে দেখা গেল, শিশুদের পক্ষে এতগুলো হরফ চটজলদি আয়ত্ত করা শক্ত। তাই ১৯৪৮ সালে প্রাথমিক পড়ুয়াদের জন্যে সাংকেতিক অক্ষরের সংখ্যা আরও কমিয়ে আটশো আশি করা হয়। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণমালাকে বলে কিয়োকো কাঞ্জি।

জটিল হলেও জাপানি ভাষা খুব সমৃদ্ধ। হারুকি মুরাকামির কথা শুরুতেই বলেছি, যদিও তিনি নোবেল পাননি। কিন্তু, এ পর্যন্ত দু-জন জাপানি সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা (১৯৬৮) এবং কেনজাবুরো ওয়ে (১৯৯৪)। কাওয়াবাতার বই বাংলায় অনুবাদ হয়েছে এবং পাওয়াও যায়। এ ছাড়া দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালকদের তালিকায় রয়েছেন আকিরা কুরোসাওয়া। তাঁর তৈরি ফিল্ম দুনিয়ার সেরা সব পুরস্কারে সম্মানিত, যেমন আমাদের সত্যজিৎ রায়। কুরোসাওয়ার 'রশোমন' সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি।

সব শেষে বলি, কাজুও আজুমার কথা। রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষটি বার বার এসেছেন এ-দেশে, যত্ন করে শিখেছেন বাংলাভাষা। জাপানিতে অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্র-রচনা। ফলে জাপানের সঙ্গে আমাদের মনের বাঁধনটি খুব আলগা নয়।

নেহা চৌধুরী

বইভব

আ দি ই তি হা সে র প থে

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা, 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকা সম্পাদনা কিংবা জীবনানন্দ নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ আগ্রহী পাঠকদের উৎসাহের বিষয় হলেও, তাঁর ইতিহাস গবেষণার ব্যাপ্তি সম্পর্কে অধিকাংশেরই যথাযথ কোনো ধারণা নেই। ফলত উদাসীনতার অন্তরালেই চাপা পড়ে গেল সেই অসামান্য গ্রন্থ 'অজানা বঙ্গকে জানো'। বইটি প্রকাশিত হয় ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে। এর আগে ১৩৬০ বঙ্গাব্দে সঞ্জয় ভট্টাচার্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছিলেন— 'A History of Mahenjodaro'। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' কিংবা নীহাররঞ্জন রায় রচিত 'বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)'-এর মতো আকর গ্রন্থগুলির কথা মনে রেখেই বলছি, দেখার মৌলিকতা ও বিষয়ের গভীরতার প্রেক্ষিতে 'অজানা বঙ্গকে জানো'র একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট হওয়ার কথা ছিল। আক্ষেপের বিষয়, সেই রৌদ্রময় সম্ভাবনাকে ঢেকে দিল অমনস্কতার কুয়াশা।

'অজানা বঙ্গকে জানো'র লক্ষ্য ইতিহাসের পুনর্বিচার। অবলুপ্ত পথচিহ্নের সন্ধান। বাংলা ও ভারতের ইতিহাস নিয়ে প্রচলিত ভাবনাকে শানিত প্রশ্নের মুখোমুখি করা। বইটি আয়তনে ছোটো। 'ভূমিকা' ও 'শেষ কথা' নিয়ে মোট দশটি অধ্যায়। কিন্তু স্বল্পপরিসরে ভূগোল, নৃতত্ত্ব, দেশি ও বিদেশি পুরাণ, ধর্মতত্ত্ব, তন্ত্রশাস্ত্র ও লোককথার যোগসূত্রে ইতিহাসকে নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য গল্পের আঙ্গিকে বঙ্গ-জাতির প্রাচীনতা, ধর্ম-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন। কমবয়সি পাঠকদের জন্য এই বই রচিত, তাই বিশ্লেষণকে মনোরম করতে গৃহীত হয়েছে কথকতার রীতি। পাশাপাশি যে জরুরি কথাটি বলতে হবে— প্রাজ্ঞ, পরিণত পাঠকদের ভাণ্ডারও তথ্যে-তত্ত্বে বিকল্প ধারার ইতিহাসচিন্তায় পরিপূর্ণ করে তুলেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

আমাদের বিস্মিত করে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বহুশাস্ত্রে জ্ঞানের পরিধি। বাংলার এই ইতিহাস পড়তে পড়তে তা অনুভব করা যায় ছত্রে ছত্রে। কিশোর পাঠকদের দিকে তাকিয়ে লেখক অধ্যায়গুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা সীমিত করেছেন। তিনি অধ্যায়ের পরিবর্তে 'কথা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন প্রথম কথা 'বাংলার মাটি, পাথর, তামা', দ্বিতীয় কথা 'বাংলার জল ও জনসমাজে'র পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে আট ও এগারো। এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে এত বহুমাত্রিক অনুষঙ্গ ও তুলনামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন লেখক, যার ফলে বক্তব্য যেন পাত্র থেকে উপচে পড়ছে। আলোচনায় আরও কিছু বিস্তৃতির অবকাশ ছিল। সে-ক্ষেত্রে লেখকের দ্রুত প্রসঙ্গোত্তরে যাওয়ার তাড়া থাকত না। তবে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মনন-প্রক্রিয়া কখনও বিচারনিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত নয়। আর আসর জমানো পরিবেশন-ভঙ্গি— এর পেছনে নিশ্চিতভাবে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সহৃদয় কবিমনখানি ক্রিয়াশীল।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও বেড়াচাঁপার উৎখনন বাংলার ইতিহাসের প্রাচীনতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে বর্ধমানে অজয় নদের অববাহিকায় রাঢ়বঙ্গে পাণ্ডুরাজার ঢিবি। গ্রিকরা এই অঞ্চলকে বলতেন 'গঙ্গারিডি'। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় 'গঙ্গাহৃদি'। পাণ্ডুরাজার ঢিবির তিনটি স্তর। প্রথম স্তর সুমেরীয় সভ্যতার সমসাময়িক, খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দের। চাষি ও কুমোর সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের নিদর্শন রয়েছে এই স্তরে। দ্বিতীয় স্তর খ্রিস্টপূর্ব ২০০০থেকে ১৫০০ অব্দের। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে পাওয়া যায় মাটির পাত্র, তামার অলংকার। দ্রাবিড় সভ্যতার কালে চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালানো হত। উৎখননে তামা পাথরের সঙ্গে উঠে এসেছে কাঠকয়লা। আর্যরা আগুন জ্বালাবার জন্য কাঠ ব্যবহার করতেন, যাকে তাঁরা বলতেন অরণি। আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়-চিহ্ন ধারণ করছেপাণ্ডুরাজার ঢিবি। অন্য দিকে ভাগীরথীর পূর্বতটে ব-দ্বীপ চন্দ্রকেতুগড়, বর্তমান বেড়াচাঁপায় পোড়ামাটির যক্ষিণী মূর্তি পাওয়া গেছে। লেখক বলেছেন, এই অঞ্চলের সভ্যতা রাজা বিক্রমাদিত্যের সমকালীন। মেঘদূতের যক্ষ-যক্ষিণীর কথা মনে পড়েছে লেখকের।

বাংলার প্রাচীন জনপদ, নগর, বন্দরের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের আলোচনা মূল্যবান। যেমন মেদিনীপুরের প্রাচীন সমুদ্র-বন্দর তাম্রলিপ্ত। কিংবদন্তি রয়েছে, রাজা তাম্রধ্বজের নাম থেকেই তাম্রলিপ্তের নামকরণ। রাজার পতাকা নাকি তামার তৈরি। ঘাটশিলার খনি থেকে তামা এনে তাম্রলিপ্তের বন্দরপথে বণিকরা তামা বিদেশে রপ্তানি করতেন। উপকথার সঙ্গে ও জনসাধারণের বিশ্বাসের সঙ্গে ইতিহাস নানাভাবে জড়িয়ে থাকে। বর্গাভীমার মূর্তি মেদিনীপুরে পূজিত হয়। বর্গা এক অপ্সরার নাম, তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের বিবাহের কাহিনিতে নদীমাতৃক বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মহাভারতের অংশ। কচ্ছ থেকে কাঁথি শব্দটি এসেছে। সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, রূপনারায়ণ, দামোদর, অজয়ের জলই মহাভারত-কথিত পঞ্চতীর্থের জল বলে উল্লেখ করেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। নিষাদ-শবর-কিরাতদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে বঙ্গসংস্কৃতির আদি রূপ। শিব দ্রাবিড় সভ্যতার আদি দেব। তার আর-এক নাম পশুপতি। শিবের শক্তির তন্ত্রমতে একটি রূপ শিবা। শিবার অন্যতম প্রতিশব্দ শেয়াল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি যেমন ধীরে ধীরে দেবতা হয়ে উঠল, গাছ-পাখি-পশুরা তেমনি পরিণত হল কুল-প্রতীকে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, শিব ও প্রান্তিক মানুষের সম্পর্ক প্রাগিতিহাস কাল থেকে বহমান। শিব মনোলিথ প্রস্তর যুগেও উপাস্য ছিলেন।

শব্দের উৎস কীভাবে মিশে থাকে ধর্ম অর্থনীতি ও সমাজ-ভাবনার সঙ্গে, তা নিয়ে সপ্তম কথায় পৃথক আলোচনা আছে। সীতা উদ্ধারের জন্য রাম সেতু বানিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে লঙ্কায় পৌঁছেছিলেন। কন্যাকুমারিকার কাছে সমুদ্রের নীচে পাথরের প্রাকৃতিক গঠন মহাকাব্যিক কল্পনায় বদলে গেল। এই সেতুবন্ধের নাম মৌর্যযুগে কৌটিল্য দিয়েছিলেন 'কালাম্বু'। সেখান থেকেই লঙ্কার নাম কলম্বো। অস্ট্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে দশবিদ্যার মিথস্ক্রিয়ার কথা বললেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। হাজারিবাগের ছিন্নমস্তা বিদ্যামূর্তি এর সাক্ষ্য বহন করছে। দ্রাবিড় সংস্কৃতিতে মাতৃতান্ত্রিকতা ছিল। আদিম সমাজতান্ত্রিক জীবনে মা-ই প্রধান। ঋগ্‌বেদের যুগে ধীরে ধীরে পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেল। বিষ্ণুর আবির্ভাব শিবের পরে। বিষ্ণু আর্য-দ্রাবিড় সংস্কৃতির সন্ধিক্ষণের দেবতা। শিবের কন্যা মনসার মাটির ঘটে পূজার প্রসঙ্গে উঠে এল

মৃত্তিকা-আশ্রিত জনসাধারণের ধর্মবোধ। বাংলায় আর্য-অনার্য সমীকরণ অন্তর্লীন হয়ে আছে অনেকগুলি স্তরে। জলদেবতা বরুণ বৈদিক গ্রন্থসমূহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। অনার্য 'বরু' শব্দের সঙ্গে 'ন'-ধ্বনি যোগে বরুণের উদ্ভব।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রাকৃত মানবগোষ্ঠীর বিকাশের বিভিন্ন পর্ব উল্লেখ করেছেন। আবহমান মানুষের ওপর, মানবিকতার ওপর লেখকের গভীর আস্থা। বইয়ের পরিশিষ্টে বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ দীপংকর লাহিড়ীর বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ, মূল্যবান একটি পরিচায়ক নিবন্ধ যুক্ত হয়েছে। এখানে সংশয় জাগে, আশি পৃষ্ঠার মূল বই, তাকে পরিচিত করার জন্যে কেন বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠার নিবন্ধ! 'অজানা বঙ্গকে জানো' তো নিজগুণেই সমৃদ্ধ। ছ-টি তাৎপর্যপূর্ণ আলোকচিত্রে শিয়ালকোট, মহেঞ্জোদরো ও নাল সংস্কৃতির সময়ের মাথার খুলির সঙ্গে পাণ্ডুরাজার ঢিবির আমলের মাথার খুলির সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা ও বিকাশের ইতিহাস গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে আছে। এই ঐতিহ্য পরবর্তী কালে প্রবলতর ধর্মের পীড়নে লুপ্ত হয়ে গেল। 'বাংলার জল ও জনসমাজ' অধ্যায়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্য আলোচনা করলেন নদী কীভাবে গড়ে তুলেছিল প্রত্ন-বাংলাকে এবং প্রস্তুত করেছিল পৌণ্ড্রবর্ধন, প্রাগ্‌জ্যোতিষ-সহ বৃহত্তর বঙ্গের সমৃদ্ধ পটভূমি। অতীত ও বর্তমান বাংলা লালিত নদীর স্নেহধারায়। সমন্বয়ই বঙ্গসভ্যতার প্রাণ। লেখক বললেন, "আজকের বাঙালী নিষাদ-শবরভুক্ত নয়, কিরাত-দ্রাবিড়ভুক্ত নয়, আর্য নয়— সবকিছুই আবার। বহুজন-কৃতি মিশিয়ে বাঙালী জাতির সংস্কৃতি।"

দেবজ্যোতি রায়

সবজান্তা

নভেম্বর কথা

১. ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ। ইতালীয় বংশোদ্ভূত ক্রিস্টোফার কলম্বাস এই বছরের ৩ নভেম্বর আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের ডোমিনিকা দ্বীপে অবতরণ করেন। সে-দিনটি ছিল রবিবার। লাতিন শব্দ ডোমিনিকার মানে রবিবার। তাই কলম্বাস দ্বীপটির নামকরণ করেন ডোমিনিকা।

২. ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর দিনটিতে উইলিয়ম শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি নাটক 'ওথেলো' প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটি প্রথম লিখিত হয় আনুমানিক ১৬০৩-এ, যখন শেক্সপিয়রের বয়স উনচল্লিশ বছর। প্রসঙ্গত, 'ওথেলো' পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত এবং অভিনীত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। আমাদের বাংলাতেও একাধিক অনুবাদ আছে এবং নাটকটি মঞ্চস্থও হয়েছে বহুবার।

৩. ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দ। ২১ নভেম্বর। ফ্রাঁসিস-মারি আরুয়ে নামে এক শিশুর জন্ম এই দিনে, প্যারিসে। চব্বিশ বছর বয়সে নিজেই নিজের নাম রাখেন ভলতেয়ার। এবং এই নামেই জগৎজোড়া খ্যাতি। সমস্ত কুসংস্কারের কট্টর সমালোচক, রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা করার প্রবক্তা এবং কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, বিজ্ঞানলেখক ও সমাজচিন্তক ভলতেয়ারকে যুগান্তকারী ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিক বলা হয়, যদিও তিনি সেই বিপ্লব দেখে যেতে পারেননি। ভলতেয়ারের মৃত্যুর (১৭৭৮) পরের বছর শুরু হয় ফরাসি বিপ্লব।

৪. ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর। বিখ্যাত 'গালিভার'স ট্রাভেলসে'র লেখক জোনাথন সুইফটের জন্ম। জোনাথন ছিলেন অ্যাংলো-আইরিশ। ডাবলিনের সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথিড্রালের তিনি ছিলেন ডিন। মূলত একজন ব্যঙ্গ-লেখক। নানা ছদ্মনামে লিখেছেন। তবে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি পেয়েছে 'গালিভার'স ট্রাভেলস', যেটি তিনি লিখেছিলেন লুমিয়েট গালিভার নামে। এ ছাড়া তাঁর কয়েকটি বই 'এ মডেস্ট প্রোপোজাল', 'এ জার্নি টু স্টেলা' ইত্যাদি। তবে কবিতা, ব্যঙ্গারচনা এবং প্রবন্ধ লিখলেও তাঁর আশ্চর্য রচনা 'গালিভার'স ট্রাভেলস', যেটি তিনি লিখেছিলেন ১৭২৬ সালে।

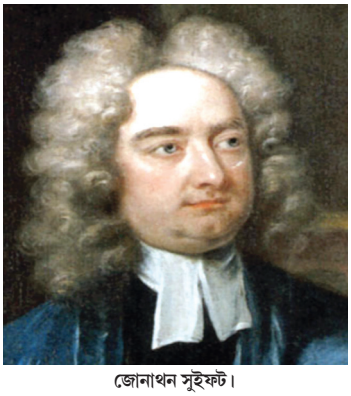

জোনাথন সুইফট।

ডিসেম্বর কথা

১. ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর। বই প্রকাশনার জগতে দিনটি একটি মাইলফলক। ওই দিন এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। কলিন ম্যাকফারকার (Colin Macfarquhar) নামে এক প্রকাশক ও বই-বিক্রেতা এবং অ্যান্ড্রু বেল (Andrew Bell) নামে এক ছাপাইকারী এটির প্রথম পরিকল্পনা করেন। দুজনেই এডিনবরার মানুষ। সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁরা দেন আটাশ বছর বয়সি উইলিয়ম স্মেলি নামের এক স্কটিশ তরুণকে, দুশো পাউন্ড স্টার্লিং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। প্রকাশক হিসেবে নাম ছিল 'এ সোসাইটি অব জেন্টেলমেন ইন স্কটল্যান্ড'।

২. ১৭৭০। ১৭ ডিসেম্বর বিশ্বসংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ওই দিন জার্মানির বন শহরে জন্ম হয় সুরকার লুডউইগ ভ্যান বিটোভেন (Ludwig van Beethoven)-এর। সংগীত-পরিবারের সন্তান। একুশ বছর বয়সে চলে যান ভিয়েনায়। আমৃত্যু সেখানেই ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত সুর বা কম্পোজিশনগুলোর মধ্যে রয়েছে ন-টি সিম্ফনি, পাঁচটি পিয়ানো কনচের্টো, একটি ভায়োলিন কনচের্টো, বত্রিশটি পিয়ানো সোনাটা এবং ষোলোটি স্ট্রিং কোয়ার্টেট। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে জগদ্‌বিখ্যাত এই সংগীত-রচনাকার কানে কম শুনতে শুরু করেন। এবং জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণ বধির। এই পর্বেই তাঁর সেরা কম্পোজিশনগুলোর সৃষ্টি।

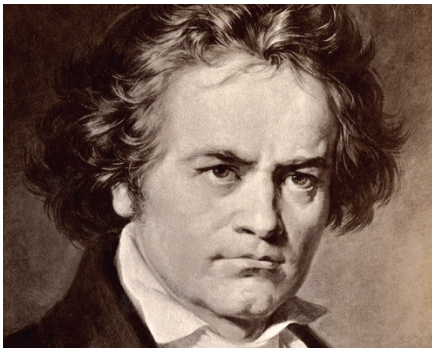

বিটোভেন।

এবার বলো

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ। ১৭ নভেম্বর। এই দিনটিতে ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একটি জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্তটির সঙ্গে বাঙালির আবেগ জড়িয়ে আছে।

সিদ্ধান্তটি কী?

সাফল্যের মণিকুট্টিম ঘরে প্রবেশের হাজার দরজা। ঢুকে পড়ুন যেকোনো দোর খুলে। এখানে নামার কোনো সিঁড়ি নেই, শুধু উঠে যেতে হবে। দেশে আর বিদেশে শিক্ষার নানা ক্ষেত্রের সুলুকসন্ধান রয়েছে এই বিভাগে।

উচ্চশিক্ষার নানা পথে

মহম্মদ মহসীন আলি

মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর-পরই অভিভাবকদের মনে ভিড় করে নানান ভাবনা। ছেলে-মেয়েকে কী পড়াব, কোথায় পড়াব, কোন বিষয়ে পড়াশোনা এগোলে ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বস্তি পাওয়া যায় ইত্যাদি। গতানুগতিক পড়াশোনা ছাড়াও নানান দিক আছে, যেগুলো সম্বন্ধে আমরা তেমন ধারণা রাখি না। অথচ সেইসব বিষয়ে পড়াশোনা করলেও ভবিষ্যতে সম্মানের সঙ্গে ভালো উপার্জন করা যায়। তেমনই কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হল এই পর্বে।

জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন

খেলা থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, দেশ-বিদেশের খবর প্রভৃতি বিষয়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়তি কৌতূহল আছে, তাদের জন্য এই বিষয়টি খুবই উপযুক্ত। সাংবাদিকতা পেশায় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ছাত্র-ছাত্রীকে একটি ভাষার ওপর শুদ্ধভাবে বলা, লেখা এবং পড়ায় বিশেষভাবে দখল রাখতে হবে। সাংবাদিকতা এবং গণসংযোগ—দুটি বিষয়ই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। জার্নালিজম আসলে মাস

কমিউনিকেশনেরই অঙ্গ। একটি মাধ্যমকে ব্যবহার করে কীভাবে সহজেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোনো যায়, সেটাই মাস কমিউনিকেশনের বিষয়বস্তু। এখানে ই-জার্নালিজম, মিডিয়া সংক্রান্ত আইন, নীতি, রিপোর্টিং, এডিটিং ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা হয়।

উচ্চ-মাধ্যমিকের পর মাস-কমিউনিকেশন স্নাতক স্তরে পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়া যেতে পারে:

আশুতোষ কলেজ ৯২ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬, ফোন: ০৩৩-২৪৫৫ ৪৫০৪/৪৫৯৯, ওয়েবসাইট: www.asutoshcollege.in।

শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ ১০ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট, শোভাবাজার, কলকাতা ৭০০ ০০৫, ফোন: ০৩৩-২৫৫৫ ৪১১৭/৩৬৪৭, ওয়েবসাইট: www.sajaipuriacollege.in।

লরেটো কলেজ ৭ স্যার উইলিয়াম জোনস সরণি (মিডলটন রো), কলকাতা ৭০০ ০৭১, ফোন: ০৩৩-২২৬৪ ০৯৫২/৪০০৫ ৫৭১২, ওয়েবসাইট: www.loretocollege.in।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন ৩৩ শ্রীমা সারদা সরণি (নয়া পট্টি), সাউথ দমদম, কলকাতা ৭০০ ০৫৫, ফোন: ০৩৩-২৫৫১ ৩৪৫২/২৫৭৯ ১৬৩৮, ওয়েবসাইট: www.rksmvv.ac.in।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ নিউ ব্যারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ফোন: ০৩৩-২৫৩৭ ৩২৯৭/৮৭৯৭, ওয়েবসাইট: www.apccollege.ac.in।

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ ৮২ বিজয়গড়, কলকাতা ৭০০ ০৩২, ফোন: ০৩৩-২৪১২ ৪০৮২, ওয়েবসাইট: www.vjrc.org।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন ২৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ফোন: ০৩৩-২৩৫০ ১৫৬২/২৩৮৯, ওয়েবসাইট: www.sncw-cal.ac.in।

নিউ আলিপুর কলেজ ব্লক-এল, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৫৩, ফোন: ০৩৩-২৪০৭ ১৮২৮, ২৪৪৫ ২১৩১, ওয়েবসাইট: www.newalipurcollege.ac.in।

ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজ নিউটাউন, রাজারহাট রোড, আর গোপালপুর, কলকাতা ৭০০ ১৩৬, ফোন: ০৩৩-২৫৭৩ ১০৪০, ওয়েবসাইট: www.deroziomemorialcollege.org। এ ছাড়া এ-রাজ্যে আরও কিছু প্রতিষ্ঠানেও জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন পড়ানো হয়।

উল্লিখিত কলেজগুলিকে ভারতবর্ষের প্রথম দশটি নাম করা মাস-কমিউনিকেশন কলেজ হিসেবে গণ্য করা হয়:

সিমবায়োসিস ইনসটিটিউট অব মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন, পুনে সিমবায়োসিস নলেজ ভিলেজ, লাভালি মুলসি, পুনে, মহারাষ্ট্র ৪১২ ১১৫, ফোন: ০২০-৩৯১১ ৬১০০/৬১১১, ওয়েবসাইট: www.simc.edu।

লেডি শ্রীরাম কলেজ ফর উইমেন, দিল্লি লালা লাজপত রায় রোড, লাজপত নগর (পার্ট ৪), নিউ দিল্লি ১১০ ০২৪, ফোন: ০১১-২৬৪৩ ৪৪৫৯, ওয়েবসাইট: www.lsr.edu.in।

খ্রাইস্ট ইউনিভার্সিটি, বেঙ্গালুরু হোসুর মেন রোড, বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক ৫৬০ ০২৯, ফোন: ০৮০-৪০১২ ৯১০০, ওয়েবসাইট: www.christuniversity.in।

মনিপাল ইনসটিটিউট অব কমিউনিকেশনস, মণিপাল স্কুল অফ কমিউনেকেশন প্রেস কর্নার, মণিপাল ৫৭৬ ১০৪, ফোন: ০৮২০-২৯২ ২৯৫৩/২৩৯০, ওয়েবসাইট: www.manipal.edu/soc।

অ্যামিটি স্কুল অব কমিউনিকেশন, নয়ডা সেক্টর ১২৫, নয়ডা, উত্তর প্রদেশ ২০১ ৩১৩, ফোন: ০১২০-২৪৪ ৫২৫২, ওয়েবসাইট: www.amity.edu/asco।

দিল্লি কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড কমার্স, নিউ দিল্লি শহিদ সুধীর সুভারওয়াল মার্গ, নেতাজি নগর, নিউ দিল্লি ১১০ ০২৩, ফোন: ০১১-২৪১০ ৯৮২১, ওয়েবসাইট: www.dcac.du.ac.in।

ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজ ফর উইমেন, নিউ দিল্লি ৩১ শ্যামনাথ মার্গ, ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজ, সিভিল লাইন্স, নিউ দিল্লি ১১০ ০৫৪, ফোন: ০১১-২৩৯৬ ২০০৯, ওয়েবসাইট: www.ipcollege.ac.in।

কে সি কলেজ অব আর্টস, সায়েন্স অ্যান্ড কমার্স, মুম্বাই ১২৪ দিনসাউ ওয়াচ্ছা রোড, চার্চগেট, মুম্বাই ৪০০ ০২০, ফোন:০২২-২২৮৫ ৫৭২৬, ওয়েবসাইট: www.kccollege.org.in।

কমলা নেহেরু কলেজ ফর উইমেন, দিল্লি শ্রী ফোর্ট রোড, নিউ দিল্লি ১১০ ০৪৯, ফোন: ০১১-২৬৪৯ ৪৮৮১/৫৯৬৪, ওয়েবসাইট: www.knc.edu.in।

ম্যাড্রাস খ্রিস্টান কলেজ, চেন্নাই ভেলাচেরি রোড, তামবারাম ইস্ট, চেন্নাই, তামিলনাড়ু ৬০০ ০৫৯, ফোন: ০৪৪-২২৩৯ ৭৭৩১/৬৭৭২, ওয়েবসাইট: www.mcc.edu.in।

সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব ঝাড়খন্ড ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে উচ্চ-মাধ্যমিকের পর ফাইভ ইয়ার ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম ইন মাস কমিউনিকেশন পড়ানো হয়। এখানে চল্লিশটি আসন আছে। সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কমন এন্ট্রান্স টেস্ট (CUCET) পরীক্ষার মাধ্যমে এখানে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যায়। সাধারণত প্রতি বছর মার্চ মাসে এই পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে হয়।

যোগাযোগ: সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব ঝাড়খন্ড, রাতু-লোহারডাগা রোড, ব্রামবি, রাঁচি ৮৩৫ ২০৫, ফোন: ০৬৫৩১-২৯৪ ১৬৩, ই-মেল: admission@cuj.ac.in, ওয়েবসাইট: www.cuj.ac.in।

ফ্যাশান ডিজাইনিং ও ফ্যাশান টেকনোলজি

যেসব ছাত্র-ছাত্রীদের সৌন্দর্যবোধ বেশি, যারা সৃজনশীল কাজ করতে উৎসাহী, যাদের আধুনিক রুচিসম্মত মানসিকতা আছে, তারা এইসব কোর্সে সহজেই সাফল্য পেতে পারে। ফ্যাশান ডিজাইনিং-ফ্যাশান টেকনোলজি ও ডিজাইনিংয়ের বিভন্ন বিষয় আছে, যেমন— নেটওয়ার্ক ডিজাইনিং, কমিউনিকেশন ডিজাইনিং, অ্যাপারেল ডিজাইনিং, অ্যাকসেসারিজ ডিজাইনিং, টেক্সটাইল ডিজাইনিং, লেদার ডিজাইনিং, ডিজাইনিং স্পেস, প্রোডাক্ট ডিজাইনিং, ফ্যাশান কমিউনিকেশন, জুয়েলারি ডিজাইনিং, ডায়মন্ড ডিজাইনিং, জেমোলোজি ইত্যাদি। উচ্চ-মাধ্যমিক পাসের পর স্নাতক স্তরে বা স্নাতক স্তরের পর ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট অথবা স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হওয়া যায়। এইসব কোর্সে সফলভাবে উত্তীর্ণ হলে উচ্চ বেতনের চাকরি লাভ করা যায়। ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে এইসব কোর্স করার সুবিধা রয়েছে।

ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব ফ্যাশান টেকনোলজি (NIFT) এটি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত ভারতবর্ষে ফ্যাশান ডিজাইনের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। কলকাতা, নিউ দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, গান্ধীনগর, হায়দেরাবাদ ও মুম্বাইয়ে এই প্রতিষ্ঠান আছে। www.niftindia.com, এই ওয়েবসাইট থেকে ভর্তির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে।

ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন (IIAD) এই প্রতিষ্ঠান লন্ডনের কিংসটন ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করে। ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন কমিটি দ্বারা পরিচালিত ভর্তির পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাইকৃত ছাত্র-ছাত্রীরাই কেবল সুযোগ পায়।

যোগাযোগ: দি অ্যাডমিশন ডিপার্টমেন্ট, ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন, বি ২৬ ওখলা, ফেজ ১, নিউ দিল্লি ১১০ ০২০, ফোন: ০১১-৪১৩৮ ০০০০/৪১৩১ ৫১৯১, ওয়েবসাইট: www.iiad.edu.in।

আর্চ অ্যাকাডেমি অব ডিজাইন (AAD) এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হলে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে হয়। অল ইন্ডিয়া এন্ট্রান্স এগজামিনেশন ফর ডিজাইন (AIEED) পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাইকৃত যোগ্য প্রার্থীরা ভর্তির সুযোগ পায়। পরীক্ষা এবং ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় বা ওয়েবাসাইটে খোঁজ নিলে বিস্তারিত জানা যাবে।

যোগাযোগ: আর্চ অ্যাকাডেমি অব ডিজাইন, প্লট নম্বর ৯, গোবিন্দ মার্গ, মালভিয়ানগর ইনসটিটিউশনাল এরিয়া, জয়পুর ৩০২ ০১৭, ফোন: ০১৪১-৪০৬ ০৫০০/০২/০৩, ওয়েবসাইট: www.archedu.org।

জি ডি গোয়েঙ্কা স্কুল অব ফ্যাশান অ্যান্ড ডিজাইনিং ইতালির বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান পলিটেকনিকো দ্য মিলানো স্কুলের সাথে যুগ্মভাবে কোর্সগুলি পরিচালিত হয়। মনে করা হয়, পলিটেকনিকো দ্য মিলানো ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটিগুলির মধ্যে একটি। ভর্তির জন্য জি ডি গোয়েঙ্কা স্কুল

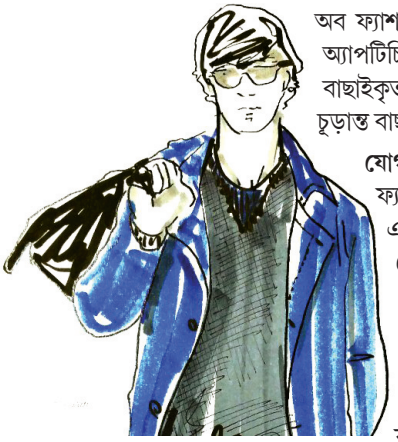

অব ফ্যাশান অ্যান্ড ডিজাইনিং একটি ডিজাইনিং অ্যাপটিচিউড টেস্টের ব্যবস্থা করে এবং এখানে বাছাইকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত বাছাই করা হয়।

যোগাযোগ: জি ডি গোয়েঙ্কা স্কুল অব ফ্যাশান অ্যান্ড ডিজাইনিং, জি ডি গোয়েঙ্কা এডুকেশন সিটি, সোহনা-গুরগাঁও রোড, সোহনা, হরিয়ানা ১২২ ১০৩, ফোন: ০৮১৩০-২৭২ ২২৫, মোবাইল: ০৯৮৭১৬ ০০০৪৫-৪৮, ০৯৮৭১৬ ০০০৫১-৫৩, ওয়েবসাইট: www.gdgoenkauniversity.com।

বনস্থলি বিদ্যপীঠ-বি. ডিজাইন এই প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র ছাত্রীদের পড়ানো হয়। এখানে প্রাথমিক পর্যায় থেকে পিএইচডি পর্যন্ত ডিজাইন কোর্সগুলি পড়ানো হয়ে থাকে। বনস্থলি বিদ্যাপীঠ অ্যাপটিচিউড টেস্টের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। ছাত্রীদের এখানে কলেজ হস্টেলেই থাকতে হয়।

যোগাযোগ: বনস্থলি বিদ্যাপিঠ, সূর্য মন্দির, পোস্ট: বনস্থলি বিদ্যাপীঠ, রাজস্থান ৩০৪ ০২২, ফোন: ০১৪৩৮-২২৮ ৩৮৪, ৩০৫ ৬৫৫, ২২৮ ৯৯০, মোবাইল: ০৯৩৫২৮ ৭৯৮৩৩, ০৯৩৫২৮ ৭৯৮৪৪, ০৯৩৫২৮ ৭৯৮৫৫, ওয়েবসাইট: www.banasthali.org।

ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব ডিজাইন (NID)

যোগাযোগ: এন আই ডি, আহমেদাবাদ ৩৮০ ০০৭, ফোন: ০৯৫৯৯ ০২৪১৮৮, ০৭৯২৬ ৬২৩৪৬২।

দি প্রোজেক্ট ম্যানেজার-সি এম এস, অল ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, ম্যানেজমেন্ট হাউস, ১৪ ইনসটিটিউশনাল এরিয়া, লোধি রোড, নিউ দিল্লি।

সিমবায়োসিস ইনসটিটিউট অব ডিজাইন (SID)

যোগাযোগ: এস নং ২৩১/৪এ বিমাননগর, পুনে ৪১১ ০১৪, ফোন: ০২০-২৬৬৩ ৪৫৪৬/৪৭/৪৮, ৬৫৬১ ৩৭৬৯/৭০, ওয়েবসাইট: www.sid.edu.in।

ফুটওয়্যার ডিজাইনিং ও জুয়েলারি ডিজাইনিং

ফুটওয়্যার ডিজাইনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইনসটিটিউট (FDDI)

যোগাযোগ: হেড-কোয়ার্টার, এ-১০/এ, সেক্টর ২৪, নয়ডা ২০১ ৩০১, গৌতম বুদ্ধ নগর, উত্তর প্রদেশ, ফোন: ০১২১-৪৫০০ ১০০।

এফ ডি ডি আই, ফুরসাতগঞ্জ সেন্টার, রায়-বেরেলি, সুলতানপুর রোড (নিয়ার পুলিশ স্টেশন), উত্তর প্রদেশ ২২৯ ৩০২, ফোন: ০৫৩৫-২৪৪ ১৫৩৫, ৫৬৩।

এফ ডি ডি আই, কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, গেট নম্বর ৩, মৌজা: কাড়াইডাঙা, গঙ্গাপুর (বানতলা সন্নিকটস্থ), দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ৭৪৩ ৫০২, ফোন: ০৩৩-৬৪৯৯ ২১১৬, ৬ ৪ ৯ ৯ ২১১২, ওয়েবসাইট: www.fddiindia.com।

জুয়েলারি ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি ইনসটিটিউট (JDTI)

যোগাযোগ: জে ডি টি আই ইন্ডিয়া, এ-৮৯, সেক্টর ২, নয়ডা ২০১ ৩০১, উত্তর প্রদেশ, ফোন: ০১২০-৪০৫ ৭৭৭৭, মোবাইল: ০৯৮১১১ ০০২৫১, ওয়েবসাইট: www.jdtiindia.com।

জেমোলজিক্যাল ইনসটিটিউট অব ইন্ডিয়া (GII)

যোগাযোগ: রেজিস্টার্ড অফিস: ২৯ গুরুকুল চেম্বার্স, ১৮৭-১৮৯ মুম্বা দেবী রোড, মুম্বাই ৪০০ ০০২, ফোন: ০২২-২৩৪২ ০০৩৯।

ল্যাবরেটরি সার্ভিসেস অ্যান্ড এডুকেশন সেন্টার, ৫০১/৫০২ মেহতা ভবন, ফিফথ ফ্লোর, রাজা রামমোহন রায় মার্গ, নিউ কার্নি রোড, মুম্বাই ৪০০ ০০৪, ফোন: ০২২-৬৬৫১ ৯০৩০/৩১, ২৩৮৮ ৯২৩২/৩৬। ওয়েবসাইট: www.giionline.com।

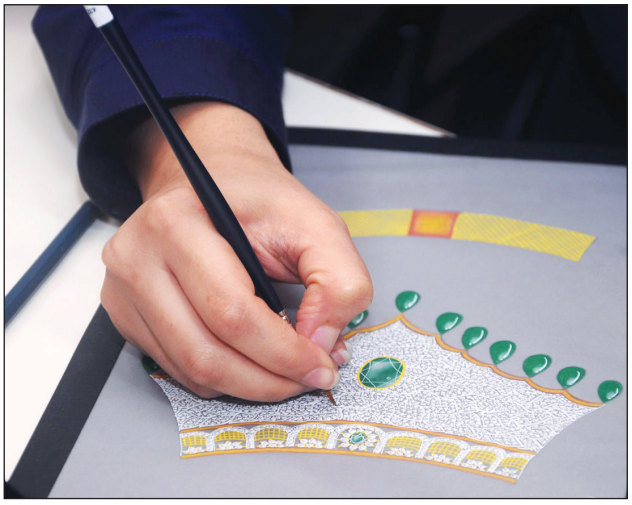

ইন্ডিয়ান ডায়মন্ড ইনসটিটিউট (IDI)

যোগাযোগ: জি আই ডি সি, কাতারগ্রাম, পোস্ট বক্স ৫০৮, সুমুল ডেয়ারি রোড, সুরাট, গুজরাত ৩৯৫ ০০৮, ফোন: ০২৬১-২৪০৭ ৮৪৭/৪৮, ওয়েবসাইট: www.diamondinstitute.net।

শ্রীমতী নাথিভাই দামোদর ঠাকরে উইমেন'স ইউনিভার্সিটি

যোগাযোগ: ১ নাথিভাই ঠাকরে রোড, নিউ মেরিন লাইনস, মুম্বাই ৪০০ ০২০, মহারাষ্ট্র, ফোন: ০২২-২২০৩ ১৮৭৯/৮২২৬, ওয়েবসাইট: www.sndt.digitaluniversity.ac।

ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব জেম অ্যান্ড জুয়েলারি (IIGJ), মুম্বাই

যোগাযোগ: আন্ধেরী সেন্টার-বাগমাল লাহমিচাঁদ পারিখ ক্যাম্পাস, প্লট নম্বর ১১১/২, ১৩ নম্বর রোড, এম. আই. ডি. সি., আন্ধেরী (ইস্ট), মুম্বাই ৪০০ ০৯৩, ফোন: ০২২-৪২৯০ ৬৬৬৬।

তারাদেও সেন্টার-ডি ১৫, কমার্স সেন্টার, ফোর্থ ফ্লোর, তারাদেও, মুম্বাই ৪০০ ০৩৪, ফোন: ০২২-২৩৫২ ৬৪৯৮, ওয়েবসাইট: www.iigj.org।

ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অফ জেম অ্যান্ড জুয়েলারি (IIGJ), জয়পুর

যোগাযোগ: মেইন ক্যাম্পাস-আর. কে. দেরেওয়ালা টাওয়ার, কে. জি. কে. ক্যাম্পাস, এস. পি. ১১১ এ, ই. পি. আই. পি., নিয়ার এস. আই. জেড., ফেজ-১, সীতাপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, জয়পুর ৩০২ ০২২, ফোন: ০১৪১-২৭৭ ১৫৭৭, ওয়েবসাইট: www.iigjjaipur.com। ■

সব পরিবারেরই কিছু বলবার কথা থাকে, যে-কথা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। আল-আমীন পরিবারেরও আছে তেমন কিছু কথা, কিছু খবর। এই বিভাগে সেইসব সমাচার।

খলতপুর শাখায় সিরাতুন্নবি (স.) অনুষ্ঠান

আল-আমীন মিশনের মূল ক্যাম্পাস খলতপুরে বাৎসরিক সিরাতুন্নবি (স.) ও ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে ছড়িয়ে থাকা মিশনের পঞ্চাশের বেশি ক্যাম্পাসে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠানটি হয়। দুই ছাত্র সানাউল্লাহ্ ও সাকিব আনজুমের কেরাত পাঠ ও বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে সকালে উদ্‌বোধন হয় অনুষ্ঠানের।

উদ্‌বোধনের পর বালক ও বালিকা বিভাগে দুটি পৃথক আয়োজনে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন যে, 'মহানবি (স.)-র নামে এই প্রতিষ্ঠান, তাঁকে প্রতিনিয়তই আমরা স্মরণ করি, তাঁর আদর্শই আমাদের চলার পথ। তবুও, আমরা সবাই এই বিশেষ দিনটির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষায় থাকি। কারণ, এই অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব অনেক বেশি।' সাধারণ সম্পাদক মহানবি (স.)-র জীবনচরিত আলোচনার পাশাপাশি, তাঁর চিন্তা-প্রক্রিয়ার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। সারাদিন ধরে চলে ছাত্র-ছাত্রীদের আজান, কেরাত, নাত-এ-রাসুল, বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতা। এই পর্বটিকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম ও সুপারিনটেনডেন্ট আব্দুল হাসেম মল্লিক। সন্ধ্যায় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মহানবি (স.)-র জীবনচরিত ও শিক্ষাদর্শ তুলে ধরেন এ-দিনের প্রধান আলোচক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব শিক্ষক মাওলানা মনজুর আলম। তিনি বলেন, অখণ্ড মানবসমাজের কল্যাণ চেয়েছেন মহানবি (স.)। কারণ, সমগ্র সৃষ্টিজগৎই আল্লাহ্‌র পরিবার। বিশ্বশিক্ষক হিসেবেই মহানবির আবির্ভাব। কোরআন ও হাদিসের বহু উদ্ধৃতি এবং ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির নানান উদাহরণ সহযোগে তিনি তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তাঁর উপদেশ, শিক্ষান্তে কর্মজীবনে তারা যেন মানব-কল্যাণকামী হয়। মহানবি (স.)-র পথ ছিল এটিই। মিশনের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মী ও প্রায় দু-হাজার পড়ুয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা মনজুর আলমের দোওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আল-আমীন উৎসব

উৎসবে স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজ

গত ১৩ ডিসেম্বর আল-আমীন মিশনের খলতপুর ক্যাম্পাসে আল-আমীন উৎসবে স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজের উদাত্ত ঘোষণা, 'নবির নামে এই মিশন। নবির নাম পৃথিবীতে যতদিন থাকবে, আমার আশা, এই মিশনও ততদিন থাকবে।' এই কথা শোনার পর অনুষ্ঠানে উপস্থিত কয়েক হাজার শ্রোতৃমণ্ডলীর মুহুর্মুহু করতালির উচ্ছ্বাসে খলতপুরে ইতিহাসের এক স্মরণীয় মুহূর্ত রচিত হয়। উল্লেখ্য, গত ১২ ডিসেম্বর এই আল-আমীন উৎসবের সূচনা হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক-এর সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজ। স্বাগত ভাষণে আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন, 'আজ থেকে তিরিশ বছর আগে যে-প্রতিষ্ঠানটিকে সামনে রেখে আমরা এই মিশনের বীজ বপন করেছিলাম, তা আজ রাজ্য ছাড়িয়ে প্রতিবেশী রাজ্যেও উপস্থিত। আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এ-কারণে যে, ওই প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশনেরই অন্যতম শীর্ষব্যক্তি এখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত। আজ আমাদের সবারই শোনার দিন, অনুপ্রাণিত হওয়ার দিন, মিশনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন।' স্বামীজি বেশ কয়েক জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রী ও প্রাক্তনীদের পুরস্কৃত করেন এবং মিশনের তরফে স্বামীজিকে মানপত্র প্রদান ও শাল পরিয়ে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়।

দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর শিক্ষকতার সাথে যুক্ত স্বামীজি তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই বলে ওঠেন, 'আমি আপ্লুত! এই পরিবেশ আমি দেখব, তা আমি কল্পনা করিনি।' মিশনের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষানুরাগী, অতিথিবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের মতো অবাক বিস্ময়ে শুনতে লাগলেন স্বামীজির কথা। স্বামীজি বলেন, 'ত্যাগের ওপর দাঁড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ মিশন এবং আল-আমীন মিশনও ঘোষণা করছে কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ত্যাগের ওপরই তা দাঁড়িয়ে থাকবে। মিশন কেবল খলতপুর ও অন্যান্য স্থানে থাকবে, তা নয়, মিশন থাকবে ছাত্র-ছাত্রী এবং সহৃদয় ব্যক্তির চিত্তেও।' তিনি মিশনের সাধারণ সম্পাদক ও তাঁর সহযোগীদের প্রাণের মানুষ বলে উল্লেখ করে বলেন, 'এঁদের আত্মত্যাগেই চলছে এই শিক্ষায়তন।' উপস্থিত

২০১৫ সালের মিলন উৎসব। স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজের অংশগ্রহণ উৎসবকে অনন্য মর্যাদা দিয়েছে। আরও বহু গুণী ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব উৎসবে অংশগ্রহণ করেন আল-আমীনের প্রধান ক্যাম্পাস খলতপুরে। যেমন প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ও পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের চেয়ারম্যান সুলতান আহমেদ, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, রাজ্যসভার সদস্য ও উর্দু দৈনিক পত্রিকা 'আখবার-ই-মাসরিকে'র সম্পাদক নাদিমুল হক, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ইঞ্জিনিয়ার শেখ আকবর হোসেন, বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি শেখ মহম্মদ ওয়ায়েজুল হক, উদয়নারায়ণপুর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বিশ্বদীপ মুখার্জী, উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চৈতালি সাঁতরা। প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিধায়ক সমীরকুমার পাঁজা। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে আল-আমীন মিশনের বিশিষ্ট কৃতী প্রাক্তনীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি ২০১৫ সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেল, জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিং, উচ্চ-মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজরকাড়া ফল করা ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। ওই দিন একটি হস্টেল বিল্ডিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সাংসদ সুলতান আহমেদ। মিশনের প্রাক্তনী মোরশেদ আলী মোল্লা প্রদত্ত একটি অ্যাম্বুলেন্সের উদ্‌বোধন করেন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দিতে গিয়ে আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম দু-দিনের আল-আমীন উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, একটি উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে সমস্ত মন্দ প্রভাবকে পাশে সরিয়ে রেখে অনাবিল আনন্দে মেতে ওঠার মাধ্যমে। আল-আমীন থেকে আমরা প্রত্যেকে শিক্ষা অর্জন করে নিজেদের ভালো থাকা ও নিজের চারপাশকে ভালো রাখার যে প্রেরণা পাই, এই উৎসব সেটাই নতুন করে স্মরণ করায়। ভালোর পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয় বছরের বিশেষ এই দুটি দিন। আল-আমীন উৎসব অন্য সকল উৎসবের দিক থেকে তাই অন্য তাৎপর্য বহন করে এই পরিবারের সকল সদস্যদের কাছে। আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখার সুপারিনটেনডেন্ট আব্দুল হাসেম মল্লিক তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আল-আমীন মিশন শুরু হওয়ার সময়ের সঙ্গে বর্তমান সংখ্যালঘু সমাজের তুলনা টেনে বলেন, আজ পিছিয়ে-পড়া সমাজ— এই কথা ততটা সবাই, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি জীবন ও চরিত্রের বহু মহার্ঘ শিক্ষার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর আহ্বান, 'বড়ো হতে গেলে ক্ষুদ্রতাকে বিসর্জন দিতে হবে, পরের জন্যে কিছু-না-কিছু করতেই হবে, দানের সাথে মানের সম্পর্ক, তাই কারোর প্রতি অনুকম্পা করলেও, তার আত্মসম্মানবোধকে আঘাত করা যাবে না, অপরকে দিলে কমে যায় না, বরং তৃপ্তি আসে।' দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ স্বামীজি আরও বলেন, 'পরের দুঃখে চোখের জল অনেকেই ফেলে, কিন্তু অপরের সুখে আনন্দিত হওয়া খুব কঠিন কাজ। এর জন্য বিশেষ মহাপ্রাণতা দরকার।' উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের ভাই ও বোন সম্বোধন করে তাদের প্রতি তাঁর উপদেশ: নিজ নিজ বাবা-মাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিতে হবে, এবং তা দিতে হবে প্রতিদিন।

সকাল ১০ টায় মিশনের প্রাক্তনী ডাক্তারদের দ্বারা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দিনের উৎসবের সূচনা হয়। এরপর সওয়া দুটোয় মিশনের ছাত্রীদ্বয় দ্বারা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও অনুবাদের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও মিশনের তরফে বক্তব্য রাখেন মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম ও সুপারিনটেনডেন্ট আব্দুল হাসেম মল্লিক। অনুষ্ঠান চলাকালীন মাঝে মাঝে কৃতী প্রাক্তনী ও ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। এরই মাঝে মিশনের প্রাক্তনীদের তরফে মিশনের লাইব্রেরিতে ষাট হাজার টাকা মূল্যের বই এবং মিশনের বালক ও বালিকা হস্টেলে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা বাবদ এক লক্ষ টাকা প্রদানের ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন— সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের যুগ্মসচিবদ্বয় শাকিল আহমেদ ও আসরফ আলি মল্লিক, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর রাকিবুর রহমান, কনসালটেন্ট (ইউনিসেফ) মেচবাহার সেখ, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আপ্ত সহায়ক আব্দুল আজিজ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাজুদ্দিন আহমেদ, বিশিষ্ট কবি একরাম আলি, আল-আমীন মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এম এ রশিদ ও ট্রেজারার আবু সালেহ মহম্মদ রেজওয়ানুল করিম, তাবারক হোসেন, শাজাহান মোল্লা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ননীগোপাল চৌধুরী।

যৌথ পরিবারের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সদস্যরা বছরের একটি সময়ে মিলিত হয় যেমন, তেমনই ছিল আল-আমীন মিশন পরিবারের

আশঙ্কার সঙ্গে কেউ-ই বলেন না। আল-আমীন মিশন এই বদলের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম হাসেম সাহেবের কথাকেই মান্য দেন তথ্য দিয়ে। তিনি বলেন, এক সময় আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বা সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য কত কম নম্বর পাওয়া পড়ুয়া থেকে শুরু করা হবে, সেটা দেখা হত, আর আজ এত বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী যে, কাদের বাদ দেওয়া হবে, সর্বোচ্চ কত শতাংশ থেকে তাদের বাছা হবে, সেটা ভাবতে হচ্ছে। এবং এই পদ্ধতি অবলম্বন করেও সব ছাত্র-ছাত্রীকে একসঙ্গে পুরস্কৃত করা যাচ্ছে না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। লন্ডনবাসী শিল্পোদ্যোগী আকবর হোসেন লন্ডনবাসীদের ঐতিহ্য-প্রিয়তার উদাহরণ তুলে আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সে-পথে চলার অহ্বান জানান। মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা আল-আমীন মিশনের সঙ্গে বর্তমান সরকারের সুসম্পর্ক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। ওয়ায়েজুল হক সংখ্যালঘু সমাজকে ফুলদানি আর সেই ফুলদানির সবচেয়ে চমকদার ফুল হিসেবে আল-আমীন মিশনকে তুলনা করেন। সাংসদ নাদিমুল হক আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো আল-আমীন মিশনও একদিন সর্বভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। তিনি এই মন্তব্য প্রসঙ্গে বহির্বঙ্গে ইতিমধ্যে আল-আমীন মিশনের বিস্তারের কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি বিধায়ক সমীরকুমার পাঁজা তাঁর বক্তব্যে জানান, বর্তমান রাজ্যসরকার সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু সকলের প্রতি সমান দরদি বলেই একই মঞ্চে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও আল-আমীন মিশনকে সম্মান প্রদান করেছে। ২০১৫ সালে আল-আমীন মিশনকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বঙ্গভূষণ সম্মান প্রদানকে সামনে রেখে তিনি ওই কথা বলেন। সকলের শেষে বক্তব্য রাখেন সাংসদ সুলতান আহমেদ। তিনি বর্তমান প্রজন্মের দিকে, মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে দৃষ্টি রেখে বলেন, 'তোমাদের ইমানদার হয়ে উঠতে হবে, প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে হবে।' তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, ইমান মানে শুধু নমাজ পড়লাম, আর নানা অন্যায় করে বেড়ালাম, তা নয়। প্রকৃত মানুষ হতে গেলে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে হবে। আজকালকার ডাক্তাররা রোগীদের ছুঁয়ে না দেখেই চিকিৎসা করে অথচ চিকিৎসা-বিধি মতে এটা যে করা যায় না, তা পরিষ্কার করে বলা আছে। আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রীরা এসব থেকে যেন দূরে থাকে। তাদের মানবিক আচরণ দেখে যেন মানুষ সহজে বুঝতে পারে যে, তারা আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রী। আল-আমীন মিশনের গঠনমূলক ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি সমাজের সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বর্তমান রাজ্যসরকারও সবরকম সহায়তা নিয়ে আল-আমীন মিশনের পাশে আছে ও থাকবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি।

পাঁচুড় শাখায় বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ১৬ ডিসেম্বর আল-আমীন মিশনের পাঁচুড় শাখায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা, রক্তদান শিবির ও প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের যৌথ উদ্যোক্তা বাংলা রেডিমেড গারমেন্টস ম্যানুফ্যাকচারারস অ্যান্ড ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও আল-আমীন মিশন। সকালে পঁচাশি জনের রক্তদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ ঘটে।

মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেলে। মিশনের দুই ছাত্র যথাক্রমে কোরআন তেলাওয়াত ও তার বাংলা অনুবাদ পাঠ করে। স্বাগত ভাষণে বি আর জি এম টি ও এ-র সম্পাদক আলমগীর ফকির পাঁচুড় শাখার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই মিশনের এই শুভ উদ্যোগে জড়িত থাকার কথা স্মরণ করে বলেন, 'মিশনের এই শাখাটি, সংখ্যায় কম হলেও, আমাদের পরিবারের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলছে।' তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই এলাকার ছেলেমেয়েরা একদিন পাঁচুড় শাখার মাধ্যমে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে, ইনশেআল্লাহ্। মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন,

'ছোটোবেলায় শুনেছিলাম অর্থ ও শিক্ষা একই ঘরে বাস করে না। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে তার বদল হচ্ছে।' তিনি আশাবাদী, কারণ, মিশন রাজ্য জুড়ে যে-সফলতা পেয়েছে, এই এলাকায়ও তা ঘটবে। এখানকার মানুষেরাও মিশনের শিক্ষা-আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করে, বিত্তের সাথে সাথে চিত্তের প্রসার ঘটিয়ে আধুনিক শিক্ষায় ইনশাআল্লাহ্ সফল হবেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যের নগর উন্নয়ন ও পুর বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম শিক্ষা প্রসারে মিশনের অবদানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, আল-আমীন মিশন আদর্শ মানুষ তৈরির কারখানা। এখানের ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ র‍্যাঙ্কের সাথে ভালো মানুষ হিসেবেও গড়ে উঠছে। দ্বিতীয় সাচার রিপোর্ট প্রস্তুত হলে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুরা মিশনের বদান্যতায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমমানে পৌঁছে যাবে বলে তাঁর আশা। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ইনতাজ আলি শাহ তিরিশ বছরের মিশনের এই-শিক্ষা আন্দোলনকে এক রেনেসাঁ বলে অভিহিত করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবু তালেব খান ভারতের উচ্চশিক্ষা নিয়ে তথ্যবহুল বক্তব্য রাখেন। এবং দেয়াল-পত্রিকা 'আমার আকাশে'র নতুন সংখ্যাটিও তিনি উন্মোচন করেন। উপস্থিত মিশনের পড়ুয়াদের তিনি রাজ্য ছাড়াও সর্বভারতীয় মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইআইটি ও উচ্চস্তরীয় গবেষণায় যেতে অনুপ্রাণিত করেন। স্থানীয় বিধায়ক মমতাজ বেগম মিশনকে সবরকম সহায়তার প্রস্তাব দেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী শাহাজান মোল্লা মিশনের এই কর্মকাণ্ডে সবাইকে সহযাত্রী হতে আহ্বান করেন। পাঁচুড় কলেজের অধ্যক্ষ হিমাংশুকুমার বসু শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে সচেতন হওয়ার অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠান চলাকালীন মাঝে মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কৃতী ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা ও প্রাক্তনীদের নানান অভিজ্ঞতার কাহিনি আয়োজনটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহেশতলা পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান আবু তালেব মোল্লা, রবীন্দ্রনগর থানার ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ সৈয়দ রেজাউল কবির, অধ্যাপক রমজান মণ্ডল, অধ্যাপক ড. শুভময় দাস, অধ্যাপক অর্ঘ্য সরকার, ডা. মমতাজ আহমেদ ও নজরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি খুবই প্রাণবন্তভাবে সঞ্চালনা করেন এই শাখার অধ্যক্ষ দিলদার হোসেন।

‘নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়ো’

আল-আমীন মিশনের উলুবেড়িয়া, নয়াবাজ, খলতপুর, সূর্যপুর, জয়নগর, নিউটাউন, খলিশানি, খড়্গপুর, মেদিনীপুর, পাঁচুড় প্রভৃতি শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গত ১৬ থেকে ২৫ ডিসেম্বর মোট পনেরোটি ‘নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়ো’ শীর্ষক শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা পরিচালনা করেন মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত মোটিভেশনাল স্পিকার সৈয়দ সায়ীদ আহমেদ। ভারতের প্রতিটি রাজ্যে ছাত্র ও যুবাদের মাঝে কর্মশালার পরিচালক সায়ীদ আহমেদ, একজন প্রাক্তন সাংবাদিক ও রাবতা ফাউন্ডেশনের সভাপতি।

এই কর্মশালায় তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের আত্ম-আবিষ্কার, দক্ষতা বাড়ানো, কৌশল শেখানো, পারদর্শিতা অর্জন, আচরণ ও জ্ঞান বিষয়ে কথোপকথন ইত্যাদি কার্যকলাপভিত্তিক সেশনে আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় তুলে ধরেন। রোল প্লের অনুশীলন, অংশগ্রহণমূলক প্রদর্শন প্রভৃতি ছিল এই ইন্টার-অ্যাকটিভ কর্মশালার অন্যতম অংশ। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানান, তাঁর এই কর্মশালা ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক বিকাশের উপযোগী করে তৈরি করা। পর্যায়ক্রমে যে-বিষয়গুলি এই কর্মশালায় ছিল, তা হল— নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ, আত্মবিশ্লেষণ, চাহিদা মূল্যায়ন, পরীক্ষাভীতি কাটানোর উপায়, শারীরিক অভিব্যক্তি, বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বর-সামঞ্জস্য, কৃতিকলা, পর্যবেক্ষণ, মতামত, জাতীয়তাবাদী ও সামাজিক চেতনা, যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রভৃতি।

প্রসঙ্গক্রমে আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন, আল-আমীনের সর্বকালীন লক্ষ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও ছাত্র-ছাত্রীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। শিক্ষান্তে কর্মজীবনে রাষ্ট্র, রাজ্য, সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি যেন তারা দায়বদ্ধ হয়। মিশনের মেদিনীপুর শাখাপ্রমুখ সেখ মহম্মদ ইস্রাফিলের মতে, সায়ীদ আহমেদের কর্মশালা ছাত্র-ছাত্রীরা খুবই উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণের ফলে প্রাণবন্ত ও সৃষ্টিশীল হয়েছে। উল্লেখ্য, সৈয়দ সায়ীদ আহমেদের কর্মশালা গত দু-বছর ধরে মিশনের বিভিন্ন শাখায় নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

‘দ্য টেলিগ্রাফ স্কুল অ্যাওয়ার্ড’

রাজ্যের নামজাদা স্কুল, পিছিয়ে-পড়াদের শিক্ষায়তন, বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে বাংলার লড়াকু পড়ুয়াদের প্রতিবছর পুরস্কার প্রদান করে ‘দ্য টেলিগ্রাফ এডুকেশন ফাউন্ডেশন’। গত ২১ নভেম্বর ২০১৫ কলকাতার সায়েন্স সিটি মঞ্চে অনুষ্ঠিত ‘দ্য টেলিগ্রাফ স্কুল অ্যাওয়ার্ড’ অনুষ্ঠানে মিশনের দুই প্রাক্তনীর সঙ্গে আল-আমীন মিশনকেও পুরস্কৃত করা হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার চকশাপুর গ্রামের বাবলু হোসেনের কোনোমতে দিনগুজরান হয়। সামান্য চাষবাস ও বিড়ি বাঁধার পেশার লড়াইয়ে তাঁর স্ত্রী আঞ্জুরা খাতুনও সামিল। এঁদের মেধাবী মেয়ে সায়রা বানু মিশনের ধুলিয়ান শাখা, রহমানিয়া অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হয় ক্লাস এইটে। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে ৭৭.৬ ও ৭৩.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে, সে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু এর পরেই শুরু হয় মিশনের উলুবেড়িয়া শাখায় জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কোচিং এবং তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও জেদের পড়াশোনা। অবশেষে সাফল্য আনে তার মুখে হাসি। কারণ, ২০১৫ সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে তার র‍্যাঙ্ক মিশনের মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ— ২৩৮। বর্তমানে সে কলকাতা মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস পাঠরতা প্রথম বর্ষের ছাত্রী। তার লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে এই পুরস্কার অনুষ্ঠানে তাকে ‘ডা. অমিয়কুমার বোস স্মৃতি পুরস্কার’ প্রদান করা হয়।

বীরভূমের জাহিরুদ্দিন মোমিন পরিবারের জীবনযুদ্ধও উদাহরণযোগ্য। রামপুরহাটের কাছাকাছি কাশিমনগর গ্রামের জাহিরুদ্দিনের বাবা হাসমাতুল্লাহ্ নিজের তাঁতে বোনা গামছা ব্যবসায়ীকে বিক্রি না করে, কয়েক মাইল হেঁটে পাশের গ্রামে বিক্রি করে। এতে প্রতি দু-জোড়া গামছা বিক্রিতে দশ-পনেরো টাকা বেশি রোজগার হয়। জাহিরুদ্দিনের চোখ ছলছল হয়ে যায়, যখন সে বলে, ‘আমার আব্বা মা এক-একটি টাকা রোজগারের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করে, তবুও তাঁরা আমার পড়া বন্ধ করেননি।’

মিশনের ধুলিয়ান শাখায় ২০০৯ সালে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয় জাহিরুদ্দিন। মাধ্যমিকে ৭০ শতাংশ ও উচ্চ-মাধ্যমিকে ৬৮.৫ শতাংশ নম্বর পেয়েও নিজের লক্ষ্যে অবিচল ছিল। পরে মিশনের উলুবেড়িয়া শাখায় জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কোচিং নেওয়ার সময়ই সে মনস্থির করে ফেলে, তাকে মেডিকেলে সফল হতেই হবে। এ-বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে ১২৮৪ র‍্যাঙ্ক করে, বর্তমানে ‘কলেজ অব মেডিসিন অ্যান্ড সাগর দত্ত হসপিটালে’ এমবিবিএস-এ প্রথম বর্ষের ছাত্র সে।

জাহিরুদ্দিনের লড়াই এখনও শেষ হয়নি। তার এই অদম্য লড়াইকে সম্মান জানিয়ে এই অনুষ্ঠানে তাকে ‘নির্মলচন্দ্র কুমার মেমোরিয়াল স্কলারশিপ ফর নলেজ এনহন্সমেন্ট’ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এখনও বাড়ি গেলে সে অভ্যাসবশত তাঁতে বসে, তবে তার বাবা আর সেরকম কর্মক্ষম না হওয়ায়, তাদের বাড়িতে তাঁত বন্ধ, গ্রামেই বিয়ে হয়েছে তার দিদির, সেখানেই সে তাঁতে আজও গামছা বোনে। তার দিদি প্রতিবাদ করে, ‘তুমি এখন গ্রামের সবারই অনুপ্রেরণা, তাঁতে বসছ কেন আবার।’ বিনয়ী জাহিরের ছোটো জবাব, ‘আমি আমার মূলকে বিস্মৃত হতে চাই না।’

রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় এরকম এক-দুজন নয়, বহু সায়রা ও জাহিরুদ্দিনের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগ্রামে তিন দশক ধরে পাশে আছে আল-আমীন মিশন। এরই স্বীকৃতি স্বরূপ এ-বছরও এই অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ পঠনপাঠনের জন্য ‘সার্টিফিকেট অব অনার’ লাভ করল আল-আমীন মিশন। উল্লেখ্য, এর আগে ২০০২, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ সালে এই ফাউন্ডেশনের তরফে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে আল-আমীন মিশনকে পুরস্কৃত করা হয়। মিশনের পক্ষে এ-বছর এই সম্মান গ্রহণ করেন মিশনের সেন্ট্রাল অফিসের আধিকারিক মহম্মদ মহসীন আলি। ■

**লেখাপড়ার ফাঁকে ছোটোদের কল্পনা ডানা মেলে পাড়ি দেয় রূপ ও কথার দেশে।
দিগন্তের নীল আর পরির পালক দিয়ে সেখানে তারা রচনা করে স্বপ্নের জগৎ।
কাঁচা মনের সেইসব রং দিয়ে সাজানো এই পাতা।**

ছোটোবেলা

সাদিয়া সিদ্দিকী
দ্বাদশ শ্রেণি, মেদিনীপুর ক্যাম্পাস

ছোটোবেলা খুঁজি আমি—
হারানো ছোটোবেলা।
ছিল কাদামাটি খেলা,
মেঠোপথ, কাঠবেড়ালি আর
শালিখের কাছে আসা।
খাঁ-খাঁ রোদ আর আম জাম কাঁঠাল পাড়া।
পাঠশালা, কেরোসিন-বাতি টিমটিম—
দেখো দেখো, ছোটোবেলা মৃদু নীল শিখা।

সেখ মিনান আহমেদ। পঞ্চম শ্রেণি, খলতপুর ক্যাম্পাস।

রোকেয়া পারভিন। ষষ্ঠ শ্রেণি, পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস।

আলো

তানিয়া সুলতানা
নবম শ্রেণি, পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস

দিন যায়, রাত যায়, কাটে সারা বেলা,
চোখে চোখে ভেসে যায় স্বপ্নের ভেলা।

সুদূর গগনে মেঘ সব দেয় পাড়ি—
বসে বসে ভাবি আমি, কোথা ওদের বাড়ি?

বৃষ্টিরা কানে কানে কত কথা বলে,
মনে মনে ভাবি আমি কোথা যায় চলে।

সূর্যি উঁকি দেয় আকাশের কোলে,
রাতের গগনে কত জ্যোৎস্না দোলে,

দোলে স্বপ্ন, দোলে আলো।

এসেছে শরৎ

মহম্মদ সাইফুল্লাহ
একাদশ শ্রেণি, খলতপুর ক্যাম্পাস

শরৎ ভীষণ দুষ্টু ছেলে
কিন্তু শরৎ লক্ষ্মী,
কখন হাসে কখন কাঁদে
টের পাবে কাকপক্ষী?
শরৎ একটু ছিঁচকাঁদুনে
কিন্তু শরৎ শান্ত,
বর্ষা-দিদির খুনসুটিতে
ভীষণই দুর্দান্ত।
মেঘ-খোকাদের সুড়সুড়ি দেয়
কাশের ডাঁটি দিয়ে,
সকাল হলেই দাপিয়ে বেড়ায়
শিউলি বনে গিয়ে।
তাকে দেখে সবাই যখন
খুব খুশিতে হাসে,
মনে খুশির আমেজ দিয়ে
সবাইকে ভালোবাসে।

রেমন সেখ। ষষ্ঠ শ্রেণি, খলতপুর ক্যাম্পাস।

সেহেনাজ হক। সপ্তম শ্রেণি, পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস।

বন্ধু

সুহানা খানাম
দশম শ্রেণি, মেদিনীপুর ক্যাম্পাস

বন্ধু বলে ডাকিস যদি, মেঘ হয়ে উঠব।
বন্ধু বলে ডাকিস যদি, ঝড় হয়ে বইব।
বন্ধু বলে ডাকিস যদি, বৃষ্টি হয়ে ঝরব।
বন্ধু বলে ডাকিস যদি, ফুল হয়ে ফুটব।

অদ্ভুত রাজপ্রাসাদ

তুহিনা গাজী
অষ্টম শ্রেণি, বাবনান ক্যাম্পাস

লিপি সুলতানা। পঞ্চম শ্রেণি, বাবনান ক্যাম্পাস।

প্রাচীনকালে এক সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। যে-রাজ্যের নাম স্বর্ণপুর। রাজার নাম অজয়। রাজা, রানি এবং তাদের এক পুত্র ছিল। রাজ্যের সমস্ত প্রজারা খুব সুখে শান্তিতে বাস করত। রাজপুত্রের এক বন্ধু ছিল। যে ছিল মাঝির ছেলে। মাঝির ছেলে নদীর তীরে একটা চকচকে শিশি দেখতে পেয়েছিল। সে শিশিটার মুখ খুলতেই, এক সুন্দরী পরি ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। সে তখন খুব ভয় পেল। কিন্তু পরিটা খুব ভালো। পরি তার এই অবস্থার কথা মাঝির ছেলেকে বলতে লাগল। একদিন এক জাদুকর পরিকে নির্দোষে শিশিতে আটকে রেখে নদীতীরে ফেলে দেয়। কিন্তু মাঝির ছেলে পরিকে মুক্ত করার উপকারের জন্যে, পরি তাকে একটা আয়না দিয়ে বলেছিল, আয়নাটিতে যখন যা ইচ্ছা সে দেখতে পাবে ও পুরোনো খবর জানতে পারবে। একদিন রাজপুত্র ও তার বন্ধু, বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিল। তারা ঘোড়ায় চড়ে অনেক পথ অতিক্রম করে পৌঁছেছিল এক রূপকথার দেশে। রাজপুরীতে প্রবেশ করে তারা সেখানে সব আশ্চর্য জিনিস দেখল। দেখল রাজ্যের সবই ঘড়ির। রাজপ্রাসাদ, গাছপালা, রাজা, রানি, রাজকুমার, মন্ত্রী, প্রজা সবাই ঘড়ির। তখন তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল এদের মধ্যে কি কোনো প্রাণ আছে? রাজা তাদেরকে দেখতে পেয়ে বলল, 'তোমরা কারা?' তখন রাজপুত্র ও তার বন্ধু অবাক হল এবং রাজাকে বলল, 'আমরা ভিনদেশ থেকে এসেছি। কিন্তু আপনারা ঘড়ির মতো হলেন কী করে?' রাজপ্রাসাদের কেউ কিছু বলল না। তারা সবাই একটা গান গাইতে লাগল:

মোদের দুঃখ মোরা সব ঘড়ির,
এটা এক রাক্ষসীর কারসাজি।
মোদের বাড়ি মোদের ঘর,
তাতে নেইকো মোদের অধিকার।

তারা গানটি শুনল এবং অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এই গানটার মধ্যে কী রহস্য আছে? রাতে তারা রাজপ্রাসাদে আশ্রয় নিল। রাতে খাবার পর রাজপুত্র এক দাসীকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা ঘড়ি হলে কীভাবে?' দাসী কিছু না বলে, আবার সেই গানটা গাইতে লাগল। তখন তারা বুঝতে পারেনি যে, তারা কেন এই গান গায়। রাজপুত্র খুবই চিন্তিত হয়ে ভাবতে লাগল, এই গানটির মধ্যে কী আছে যে, তাদের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে, তারা সকলেই এই গানটি গায়। রাজপুত্র দিন-রাত চিন্তা করতে লাগল। রাজপুত্রকে দেখে মাঝির ছেলে বলল, 'কী হয়েছে বন্ধু?' রাজপুত্র বলল, 'আমি জানতে চাই, এরা ঘড়ির মানুষ হল কী করে?' তখন জেলের ছেলে পরির দেওয়া আয়নাটা এনে পুরোনো ঘটনাটা দেখতে চাইল। তখন আয়নাতে তারা দেখতে পেল, রাজা একদিন শিকারে বেরিয়েছিল।

বনে যেতে যেতে দেখতে পেল, একজন সুন্দরী মেয়ে, যে ছিল আসলে রাক্ষসী। সে বনের মধ্যে বসে কাঁদছিল। রাজা তার কাছে গিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলে, সে কিছু বলল না। রাজা তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে আশ্রয় দিল। কিছুদিন কাটতে-না-কাটতে মেয়েটি রাজাকে বিয়ে করতে চাইল, কিন্তু রাজা বিয়ে করতে অস্বীকার করল। মেয়েটি রেগে গিয়ে রাক্ষসী-মূর্তি ধরে তার অলৌকিক জাদুশক্তির দ্বারা রাজ্যের সবকিছু ঘড়ি করে দিল ও বলল, 'তোরা এর আসল রহস্য কারোর সঙ্গে বলবি না, তোরা গানের মাধ্যমে বলতে পারিস। গানের মতো করে বলার সময় যদি কেউ বুঝতে পারে রাজপ্রাসাদের সুড়ঙ্গের নীচে রাখা একটা পাত্রে অনেক নকল হিরের মধ্যে আসল হিরে আছে। আসল হিরেটিকে যদি কেউ রাজপ্রাসাদের প্রিয় কোনো জিনিসের ওপর রাখে, এ-রাজ্য আবার পুরোনো অবস্থায় ফিরে আসবে।' ঘটনার কথা জানতে পেরে রাজপুত্র ও তার বন্ধু সুড়ঙ্গপথে নামল। তারা সেই পাত্রের কাছে পৌঁছে অনেক খোঁজার পর আসল হিরেটি খুঁজে পেল। হিরেটি যেই না হাতে তুলতে যাবে, অমনি পাত্র থেকে বেরিয়ে এল একটি মানুষ। মানুষটি তাদের রাজপ্রাসাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি কী, তা তাদেরকে বলল। তখন তারা সেই হিরেটি নিয়ে রাজকুমারীর কপালে যেই ঠেকাল, সঙ্গে-সঙ্গে ওই রাজ্যের সমস্তটাই আবার পুরোনো অবস্থায় ফিরে গেল। রাজা খুশি হয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে রাজার ছেলের বিয়ে দিল।

ওয়াসীমা পারভীন। ষষ্ঠ শ্রেণি, পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস।

বনের পরি

জিনাত হোসেন
পঞ্চম শ্রেণি, বাবনান ক্যাম্পাস

জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি।
চোখ তার জ্বলে, জামাখানি ঝলমলে।
প্রতি রাতে ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে—
সাদা-কালো জামা পরে চায় এক পরি।।
হাতে ধরা মালা, পিঠে দুটি ডানা।।
নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে করে কত কী যে।।

নাজমা খাতুন। পঞ্চম শ্রেণি, বাবনান ক্যাম্পাস।

Al-Ameen's English Medium Branches

A new way to life where Tradition meets Technology & Science
Modern Scientific method with Islamic value-based education

Fully Residential Secondary (X Std.) level Institutes for Boys

Al-Ameen Mission Academy, Milanmore

Milonmore, Pradhan Nagar, Siliguri, Darjeeling
Phone: 097322 54976, 087300 08124
(Admission for session 2016 completed)

Al-Ameen Mission Academy, Kharagpur

Sadatpur, Kharagpur, Paschim Medinipur
Phone: 097336 96050, 83730 58749
(Academic Session will be started from 2017)

Fully Residential Higher Secondary (XII Std.) & JEE Coaching Institutes

Al-Ameen Mission Academy, Ranchi

(Classes XI & XII with JEE coaching for boys)
Pundag, Jagannathpur, Ranchi, Jharkhand
Phone: 096080 90073, 83730 58749

Al-Ameen Mission Academy, Patna

(Classes XI & XII with coaching for Medical Entrance for girls)
Anishabad, Patna, Bihar
Phone: 096080 90073, 83730 58749

● **Forms will be available from 10 April 2016 (For both the Institutes)**

Al-Ameen Mission Academy, Howly

(Classes XI & XII for boys, Medium of Instruction: Assamese)
Howly, Barpeta, Assam
Phone: 096134 40210

Al-Ameen Mission Academy, Boxanagar

(Classes IX & X for boys, Medium of Instruction: Bengali)
Boxanagar, Sipahijala, Tripura
Phone: 089744 18366, 098326 70023

Run by: Al-Ameen Mission Trust

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah 712 408, West Bengal, Ph.: 03214-257 800/801
Central Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Ph.: 033-2229 3769, 3297 3580, www.alameenmission.org

We Chase Quality ...
Success Chases us !

Crash Course & Mock Tests for WBJEE (Med. & Engg.) 2016

Course Starts on 28 February 2016

Coaching Hours

Physics: 48 hrs. ‖ Chemistry: 48 hrs. ‖ Mathematics: 48 hrs. ‖ Biology: 48 hrs.

Mock Test Schedule

Mock-1 : 28-02-2016 ❙ Mock-2 : 20-03-2016 ❙ Mock-3 : 10-04-2016

Mock-4 : 24-04-2016 ❙ Special Mock (for AIPMT): 17-04-2016

Courses Offered

✔ WBJEE ✔ WBCS ✔ SSC ***(TET & SUB)*** ✔ PRIMARY TET ✔ JEE ***(MAIN & ADVANCE)***

✔ AIPMT ✔ COMBINED COURSES ***(MISC, CLERKSHIP, SSC, RAIL etc.)***

Al-Ameen Mission Study Circle

(A unit of Al-Ameen Mission Trust for Competitive Exams.)

8D Darga Road, Park Circus (Near 4 No. Bridge), Kolkata 700 017

Ph.: 033-2289 3769, Mob.: 94346 17145, 97356 42062